বিনোদিনী

শ্রীজগদীশচন্দ্র গুপ্ত

মূল্য এক টাকা মাত্র

—প্রকাশক—
শ্রীব্রজজনবল্লভ বসু
বোলপুর। (বীরভূম)।

প্রথম সংস্করণ
পৌষ, ১৩৩৪

দি মডেল লিথো এণ্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
৬৬।১এ, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা,
শ্রীশশীভূষণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

—উৎসর্গ-পত্র-

মলয়,

তুমি,

ফুল হ'য়ে ফোটোনাক' আমার অঙ্গনে—
অস্ফুট কলিটি, পরে প্রপূর্ণ যৌবনে
ঢল ঢল মুখে—
হাসিয়া হাসিয়া তুমি নাচিয়া দুলিয়া
হৃদয়ের মধুকোষ দাও না খুলিয়া
আমার সম্মুখে।—

আমার এ আম্রশাখে জাগিলে মঞ্জরী
আকুল হইয়া তুমি আস না গুঞ্জরি'
মধুপ-সমান ;
তোমার গুঞ্জনগান মুকুলের গায়ে
রাখেনা আনন্দঘন রোমাঞ্চ জাগায়ে'
সারা দিনমান।—

সাঁতারি' আস না তুমি নীল-পারাবার—
যামিনীর পুলকিত লাবণ্যসম্ভার
চাঁদের মতন ;—
পূর্ণিমায় পূর্ণিমায় তুমি নাহি ঢালো
আমার মুখের'পরে রূপময়ী আলো
মেলিয়া নয়ন।—

শুনিতে শুনিতে বেদ-বন্দনার গান
তপনের মত তব হয় না উত্থান
পৃথিবী উজলি',
নয়নে আলোক দিয়ে হৃদয়ে চেতনা
জীবনপ্রবাহমূলে তুমি ত' ঢালো না
উষ্ণ রসাঞ্জলি।—

বৈশাখের অপরাহ্নে খররৌদ্র'পরে
আস না ঈশানে তুমি সাজি' স্তরে স্তরে
মেঘের মতন—
ঢালো না গর্জ্জন করি' দীর্ঘ জলধার
ধরার তাপিত অঙ্গে, তুলি অঙ্গে তার
শ্যাম-আস্তরণ।—

নাহি শব্দ, নাহি রূপ, নাহিক কিরণ—
শুধু স্পর্শ, যেন কার নিঃশ্বাস পতন,
গোপনচারিণি ;—
আস তুমি চুমিতে এ পথশ্রান্ত দেহ—
যেন কার অনাহত সুগভীর স্নেহ—
চিনিতে পারিনি'!—

—:—

-গল্প কেন লিখিলাম-

এত লোক থাকিতে আমারই এই গল্পগুলি লিখিবার কি দরকার পড়িয়াছিল তাহার একটু ইতিহাস আছে।......সেই অনাদি নর ও নারী।

আমার স্ত্রী আলস্যে মানুষ দু'চক্ষে দেখিতে পারেন না। আমি হাত পা গুটাইয়া নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছি দেখিলেই তিনি আমার হাতে একটি পয়সা দিয়া বাজারে পাঠাইয়া দেন; বলেন, ধনে নিয়ে এস; কোনোদিন বলেন, পান; কোনোদিন, কাঁচালঙ্কা; কোনোদিন, সোডা; কোনোদিন, মউরি; কোনোদিন আর কিছু। ......কিন্তু ঐ এক পয়সার; কোনোদিন তার বেশী নয়।

হঠাৎ একদিন আপত্তি করিয়া বসিলাম, এবং আমার সে দুর্ম্মতির শাস্তি তিনি হাতে হাতেই দিলেন; তাঁর সেই অননুকরণীয় ভ্রূভঙ্গী সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল; বলিলেন,—আর কোনো উপকার না হোক্, বাতের হাত থেকে বাঁচবে।

পয়সাটি হাতে করিয়া ধনে আনিতে রওনা হইলাম।...... আসা যাওয়ায় বাজার সওয়া ঘণ্টার পথ; এবং পথের সমস্তটাই বাত-নিবারক।

এমনি করিয়া অমূলক বাতের ভয়ে বাজারে হাঁটিতে হাঁটিতে হঠাৎ ফাঁকি দিবার একটি ফন্দি মিলিয়া গেল।......

পরদিনই কাগজ আর পেন্সিল লইয়া উর্দ্ধনেত্র এবং চিন্তাগ্রস্ত হইয়া বসিলাম, এবং বসিয়াই রহিলাম।......প্রিয়ম্বদা ঘরে ঢুকিয়া লিখিবার সরঞ্জামগুলি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,- ও-গুলো নিয়ে কি হচ্ছে?

উর্দ্ধনেত্র তাঁহার দিকে নামাইয়া মনে মনে হাসিয়া বলিলাম,— বাজারে আর যাচ্ছিনে।—প্রকাশ্যে বলিলাম,—একটা গল্পের প্লট ভাব্‌ছি।

......এবং, প্রিয়ম্বদার ঠোঁটের কোণে হাসির উদয়শিখরে অতিশয় তীক্ষ্ণ হাসির একটি অঙ্কুর উঠিতে দেখিয়াই মনের লঘু ভাবটা এক-নিমেষে কাটিয়া গেল; তাড়াতাড়ি করিয়া বলিলাম,—সবাই ত' গল্পটল্প লেখে দেখি, দেখি আমিও যদি দৈবাৎ পেরে উঠি।—বলিয়া অন্যান্য কাপুরুষের মত শুষ্কমুখে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম, যেন গল্প লিখিতে পারিয়া উঠিব কি না সেই মুহূর্ত্তে সেইটাই আমার নিদারুণ ভাবনা।

......কিন্তু আসল কথা, আসা-যাওয়ায় বাজার পূরো সওয়া ঘণ্টার পথ, এবং বাতের ভয় আমার নাই।

কি ভাবিয়া প্রিয়ম্বদা আমাকে সে-যাত্রা ক্ষমা করিয়া ফিরিয়া গেলেন।

হঠাৎ এক ধাক্কা—

ধড়্‌ফড়্‌ করিয়া উঠিয়া বসিয়া দেখিলাম, প্রিয়ম্বদা সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাসিতেছেন।

বলিলাম,—একটু তন্দ্রা মত এসেছিল।—বলিয়া এম্‌নি করিয়া একটু হাসিবার চেষ্টা করিলাম, যাহার মত হৃদয়বিদারক ব্যাপার জগতে খুব কম ঘটে।

গল্পের প্লট যাহার উপর লিপিবদ্ধ করিবার অভিপ্রায় ছিল, সেই কাগজখানা প্রিয়ম্বদা ফস্ করিয়া টানিয়া লইয়া সশব্দে পড়িতে লাগিলেন,—শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং; পাটনা হাইকোর্ট; ওয়াটার-টাও[illegible] এক পয়সার ধনে'; মিঠেকড়া তামাক; ঢোঁড়া মিঞা; মা[illegible] তোর রঙ্গ দেখে' অঙ্গ জ্বলে' যায়; পয়সায় দুটো শশা; বিভূতি চৌধুরী; রামনবমী; তারি সনে দেখা হ'লে; হাতুড়ে.........

প্রিয়ম্বদা টানিয়া টানিয়া পড়িতে লাগিলেন; আর, আমার মনে হইতে লাগিল, ভগবান, মানুষের সব দুর্গতিরই যদি সীমা থাকে তবে আমার সে-সীমায় আসিতে আর কত দেরী?—

—এ-গল্প বিলেত্ পাঠাবে না দেশী কাগজেই দেবে? বলিয়া কাগজখানা আমার পাশে ছুড়িয়া দিয়া প্রিয়ম্বদা চলিয়া গেলেন।......

ঘাড়ের উপর জগদ্দল বিপদের পাথর চাপিয়া রহিল, কিন্তু দমিলাম না,......বহুক্লেশে পাঁচদিনের দিন গল্প একটা তৈরী হইল; এবং তাহাকেই অবলম্বন করিয়া আরো চারদিন বাজারকে ফাঁকি দিলাম।......

কিন্তু সে যন্ত্রণাও ভুলিবার নয়।—

এই হইল সুরু; এবং এখনও সেইভাবেই চলিতেছে।—বসিয়া বসিয়া খুঁটি ঠেস দিয়া কলম নাড়িয়া যদি ফাঁকি দেওয়া যায় তবে কে এখন ধনে' আনিতে বাজারে দৌড়ায়?......

যাহার জন্মের ইতিহাস এই রকম সে যে মানুষকে আনন্দ দিবে, নূতন কিছু দিবে সে বিশ্বাস আমার কদাপি নাই।

আমার দুইটি অশেষ হিতৈষী পরমবন্ধুর সহায়তায় এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইল; শ্রীযুত শান্তিরাম চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উদ্যোগ এবং শ্রীযুত ব্রজজনবল্লভ বসু মহাশয়ের অর্থানুকূল্য। আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং শুভেচ্ছা তাঁহারা গ্রহণ করুন।

আবরণপত্রের চিত্রখানির পরিকল্পনা করিয়াছেন প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুক্ত দীনেশরঞ্জন দাশ। আমি তাঁহার নিকট ঋণী রহিলাম।

বোলপুর,
১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪।

সূচীপত্র।

বিনোদিনী

দিবসের শেষে

রতি নাপিতের বাড়ীটার অবস্থানক্ষেত্র বড় চমৎকার—বাড়ীর পূবে নদী কামদা, পশ্চিমে বাগান ; উত্তরে বেণুবন ; দক্ষিণে যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র। সূর্য্যদেব দিগন্তরেখা স্পর্শ করিতে না করিতে তাঁর টকটকে' হিঙ্গুল আভাটি রতির গৃহচূড়া চুম্বন করে ; রতি ঠিক্ পাখীর ডাকেই জাগে.—গোধূলিতে তারা বৃক্ষাবাসে ফিরিয়া আসিতেই তাদের কলকাকলীর সঙ্গে সঙ্গে সেই শান্তির সুরে সুর মিলাইয়া তার তুলসীতলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলিয়া ওঠে ; দক্ষিণের হাওয়ায় উত্তরের বাঁশ সির্ সির্ করে, পশ্চিমে তার প্রতিধ্বনি জাগে, দক্ষিণে সুচিক্কণ শ্যামল দোলের অন্ত থাকে না ; কিন্তু এই এতবড় কাণ্ডটার প্রতি রতির দৃক্পাতও নাই—তার চোখ কান এ-সব দেখিতে শুনিতে শেখে নাই। সে যে চাক্‌রাণ জমি ভোগ করে তাহাই তার একমাত্র ধ্যান। রতি বস্তুতান্ত্রিক।

একগুঁয়ে কোপনস্বভাব না হইলে রতিকে মন্দ লোক বলা যাইত না ; এবং রতির বাড়ীর পশ্চিমে যে বাগান তাহার মালিক যাদব দাস আম কাঁঠাল সম্বন্ধে তাহাকে যে সন্দেহের চক্ষে দেখে তাহা যদি অমূলকজ্ঞানে বিশ্বাস না করা যায় তবে রতি নিষ্কলঙ্ক চরিত্র। কিন্তু লোকে সে-কথা বিশ্বাস করে। দু'ক্রোশ দূরবর্ত্তী রামচন্দ্রপুরের হাটে রতিকে গ্রামের ইতর ভদ্র অনেকেই আম কাঁঠালের কালে আম কাঁঠাল বিক্রয় করিতে দেখিয়াছে ; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, তাহা আহরণের উপায় সম্বন্ধে রতিকে সতর্ক প্রশ্ন করিয়াও তাহারা খুব সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই।

রতির একটিমাত্র ছেলে, নাম পাঁচু ও বয়স পাঁচ। রতির স্ত্রী নারাণী তিনটি পুত্রকে প্রসব-গৃহ হইতে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া পাঁচুগোপালের মাদুলী ধারণ করে—তারপর পেটে আসে এই পাঁচু। তাই অসংখ্য মাদুলী কবচ তাবিজ প্রভৃতি আধিদৈবিক প্রহরণ পাঁচুর অঙ্গে নিয়ত উদ্যত থাকিয়া যাবতীয় অমঙ্গলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রহরা দিতেছে। কিন্তু এত করিয়াও নারাণীর মনে তিলমাত্র স্বস্তি নাই। যুঝিতে যুঝিতে জাগ্রত মন্ত্র কখন নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িবে তাহার স্থিরতা

নাই ; দেবতার নির্ম্মাল্য ও প্রসাদ একসময় কমজোর হইয়া পড়িতেও পারে—তাই পাঁচু চোখের আড়াল হইলেই নারাণীর মনে হয় পাঁচু বুঝি নাই। এমনি সশঙ্ক তার উৎকণ্ঠা।

বহু আরাধনার ধন এই পাঁচু একদিন সকালবেলা ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়াই যে কথাটি বলিয়া বসিল তাহা যেমন ভয়ঙ্কর তেম্‌নি অবিশ্বাস্য। নারাণী তাহাকে হাত ধরিয়া ক্ষেতের দিকে লইয়া যাইতেছিল—নিঃশব্দে যাইতে যাইতে পাঁচু মায়ের মুখের দিকে মুখ তুলিয়া বলিল,—মা, আজ আমায় কুমীরে নেবে।

নারাণী চম্‌কিয়া উঠিয়া বলিল,—সে কি রে ?

—হ্যাঁ, মা, আজ আমায় কুমীরে নেবে।

—কি করে' জান্‌লি।

পাঁচু বলিল,—তা' জানিনে।

ছেলের সর্ব্বনেশে কথা শুনিয়া নারাণী প্রথমটা ভয়ানক চমকিয়া উঠিলেও একটু ভাবিতেই দুর্ভাবনা কাটিয়া তার বুক হাল্কা হইয়া গেল।......পাঁচু অসংলগ্ন অনেক কথাই আজ পর্য্যন্ত বলিয়াছে ;—একদিন পাঁচু সন্ধ্যাবেলায় একটি পেচককে তাদের ঘরের চালে বসিয়া অট্টহাস্য করিতে দেখিয়াছিল ; আর একদিন একটি বৃহৎ কচ্ছপকে বাচ্চাসহ তাহাদেরই উঠানে দাঁড়াইয়া নৃত্য করিতে দেখিয়াছিল।......এমনই সব অসম্ভব কথা পাঁচু নিত্য বলিয়া থাকে। পাগল ছেলে !

রতি স্ত্রীর মুখে পাঁচুর উক্তি শুনিয়া পাঁচুকেই চোখ রাঙাইয়া ধমকাইয়া দিল। এই সংশ্রবে তাহার মনে পড়িয়া গেল তাদেরই গ্রামের মৃত অধর বক্সীর কথাটা। অধর বক্সী সে-বার নৌকা-যাত্রা করিবার ঠিক্ পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাবেলায় আব্‌ছায়া জোৎস্নায় নিজেরই ছায়া দেখিয়া আঁৎকাইয়া উঠিয়াছিল,—প্রাঙ্গণে লাফাইয়া লাফাইয়া সে নিজেরই ছায়ার দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া ভীতস্বরে কেবলি চীৎকার করিয়াছিল—ও কে ? ও কে ?...সে-দিন তার রক্তবর্ণ নিষ্পলক চক্ষুর দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া থাকিতে কাহারও সাহস হয় নাই। বহু চেষ্টায় সেদিনকার মত আতঙ্কের নিবৃত্তি হইয়া সে নিরস্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তার নৌকা আর ফেরে নাই, সে-ও না। জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি সে-দিন রতিকে ডাকিয়া বলিয়াছিল,—রতি, রকম ভাল নয়, এ-টা মৃত্যুর লক্ষণ ; এ-রকম মনের ভুল হয় পাগলের কিম্বা যার মরণ ঘনিয়েছে।......

কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছিল।

তাই রতি ছেলেকে কঠোরকণ্ঠে শাসন করিয়া দিল,—খবরদার, ফের্ যদি ও-কথা মুখে আন্‌বি তবে কাঁচা কঞ্চি তোর পিঠে ভাংবো।

তখন আষাঢ় মাসের প্রথম ভাগ—নদী বাড়িয়া চড়া ডুবাইয়া জল খাড়া পাড়ের মৃত্তিকা ছল্ ছল্ শব্দে লেহন করিতেছে; স্বচ্ছ শান্ত জল পঙ্কিল ও খরগতি হইয়া উঠিয়াছে; তবু ভয়ের কোনো কারণ নাই।—এই নদী, কামদা, তার দুইতীর, আর তার জল তাহাদের চিরপরিচিত; এ নদী ত' নরঘাতিনী রাক্ষসী নহে, স্তন্যদায়িনী জননীর মত মমতাময়ী—চিরদিন সে গিরিগৃহের সুপেয় শীতল নীর তাদের পল্লী-কুটিরের দুয়ার পর্য্যন্ত বহিয়া আনিয়া দিতেছে। তাকে ভয় নাই।

স্নানের বেলায় রতি পাঁচুকে ডাকিয়া বলিল,—আয়, নেয়ে আসি।

কাঁচা কঞ্চির ভয়ে পাঁচু সেখানে কোনো প্রতিবাদ না করিয়া মায়ের কাছে ছুটিয়া গেল; মায়ের পিঠের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া দুই হাতে তার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—আমি আজ নাইব না, মা।

—কেন রে?

—ভয় করছে।

নারাণী ছেলেকে কোলে করিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া বলিল,—পাঁচু নাইবে না আজ।

রতি ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল,—কেন, কি হয়েছে?

—হয়নি' কিছু।

—তবে?

—নাইতে চাইছে না, থাক্ না আজ।

রতি আরো শক্ত হইয়া বলিল,—না, ও-র ভুলটা ভাঙ্গা দরকার। বাবুকে বল্লুম, শুনে' তিনি হাস্‌তে' লাগ্‌লেন। তিনি ত' হাস্‌লেনই, আরো কতজনে হাস্‌লে।

গ্রামের বাবু চৌধুরীমহাশয়ের সম্মুখে বসিয়া চামড়ায় ক্ষুর ঘষিতে ঘষিতে রতি পাঁচু-গোপালের উদ্ভট উক্তিটা বিবৃত করিয়াছিল। শুনিয়া বাবু নিজে ত' হাসিয়াছিলেনই, উপস্থিত অপরাপর সকলেও হাস্যসম্বরণ করিতে পারে নাই। কামদায় কুমীর? ইহা অপেক্ষা হাস্যকর উক্তি আর কি হইতে পারে! চৌধুরী বাবু বলিয়াছিলেন,—কিছু না, তুই সঙ্গে করে' নাইয়ে নিয়ে আসিস্; কুমীরে যদি নেয় ত' তোকেই নেবে—

রসিক পোদ্দার বাবুর মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিয়াছিল,—বাবু বলেছেন ঠিক, যাতে তার খোরাক্ হবে।

হলধর রাজবংশী বাবুর সম্মুখ হইতে দূরে সরিয়া কলিকা টানিতেছিল; সে একগাল ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিয়াছিল,—রতি, তুই বাবুর আশ্রয়ে থেকেও এমন অজ্ঞ? তাতে আবার জেতে নাপিত!—

ইত্যাদি বিরক্তিকর বিদ্রূপে মনে মনে রুখিয়া উঠিয়া এবং অধর বক্সীর এই শ্রেণীর ভুলের দরুণ সদ্য সদ্য নিধনপ্রাপ্তির কথাটা স্মরণ করিয়া, পাঁচুকে আজ নদীতে লইতেই হইবে সঙ্কল্প করিয়া রতি বাড়ী আসিয়াছিল।

নারাণী পাঁচুকে বলিল,—যাও, বাবা, নেয়ে' এস। সঙ্গে বড় একটা মানুষ যাচ্ছে—ভয় কিসের? বলিয়া সস্নেহে মুখচুম্বন করিয়া পাঁচুকে নামাইয়া দিল, মনে মনে তাহার সহস্র বৎসর পরমায়ু কামনা করিল।

অন্যদিন তেল মাখিবার সময় পাঁচু ছট্‌ফট্‌ করিত: আজ সে দাঁড়াইয়া নির্ব্বিবাদে তেল মাখিল, এবং বাপের গামছাখানা হাতে করিয়া তার পিছন পিছন ঘাটে আসিল।

স্নানার্থিগণের উঠানামার সুবিধার জন্য পাড় কাটিয়া জল পর্য্যন্ত ঢালু করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

জলের ধার পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়া রতি থমকিয়া দাঁড়াইল—তার কেমন ভয় ভয় করিতে লাগিল। নিস্তরঙ্গ, বিস্তীর্ণ আবিল জলরাশি যেন ভয়ঙ্কর নিঃশব্দে মধ্যাহ্নরৌদ্রে শাণিত অস্ত্রের মত ঝক্ ঝক্ করিতেছে।......তুলজ্যা তীব্র স্রোত ছুটিয়া চলিয়াছে—এতবড় একটা গতিবেগ, অথচ তার শব্দ নাই, অবয়ব নাই, ভাল করিয়া সে যেন চোখে পড়ে না: যেন গঙ্গাধরের সমস্ত দুঃশাসিত নির্ম্মম শক্তি এই নিঃশব্দ গম্ভীর গতির অনির্দ্দেশ্য বহিরবয়ব ব্যাপিয়া স্তম্ভিত হইয়া আছে।—এমন নিদারুণ নিষ্করুণ রূপ লইয়া এই প্রিয় নদীটি আর কোনোদিন তার চোখে পড়ে নাই। ইহার বাহিরটাই আজ এমন ভয়াবহ, না জানি ইহার দুর্নিরীক্ষ্য অতল গর্ভে কত হিংস্র দংষ্ট্রা মেলিয়া ফিরিতেছে!......রতি শিহরিয়া উঠিল। শঙ্কিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে সম্মুখে দক্ষিণে ও বামে বহুদূর পর্য্যন্ত চাহিয়া দেখিল—নদীর নিষ্কম্পবক্ষে একটি বুদ্বুদও কোথাও নাই।......ঠিক্ সম্মুখে ওপারের বালুচর দু'টি গ্রামের বনপ্রান্তের মধ্য দিয়া বহিয়া বহুদূরে গিয়া দিক্‌প্রান্তে মিশিয়াছে—সন্ধিস্থলটা ধূম্রধূসর দীর্ঘ একটা রেখার মতন! প্রসারিত বালুকারাশির নগ্ন রিক্ত শুভ্রতাকে সবুজ বুঁটিতে সাজাইয়া দূর দূরান্তে স্থানে স্থানে তৃণস্তূপ জন্মিয়াছে।—নদীর দুইতীর নির্জ্জন, নিঃশব্দ। রতি ভাবিতে লাগিল।.........

পাঁচু হঠাৎ সভয়ে একটা চীৎকার করিয়া ছুটিয়া আসিয়া দুইহাতে রতিকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—ওটা কি?

পাঁচুর ভয়ের কারণটাকে রতিও দেখিয়াছিল—একটা জলচর কদাকার জানোয়ার হুস্ করিয়া ভাসিয়া উঠিয়াই ডিগ্‌বাজি খাইয়া তলাইয়া গিয়াছিল।

পাঁচুর ভয় দেখিয়া রতি হাসিয়া বলিল,—শুশুক, মাছ তাড়া করেছে।

পাঁচু জিজ্ঞাসা করিল,—কেন, বাবা ?

—খাবে বলে'। ও-রা বড় বড় রুই কাৎলা মেরে মেরে খায়।

শুশুকগণ জলের ভিতরেই বড় বড় রুই কাৎলা মারিয়া খায় শুনিয়া পাঁচুর বিস্ময়ের সীমা রহিল না—জলের ভিতর ত' অন্ধকার, কেমন করিয়া খুঁজিয়া পায় ?

এই ক্ষুদ্র ঘটনায় এবং একটু হাসিতে পাইয়া রতির ভয়ে অভিভূত ভাবটা কাটিয়া গেল। তখন তাহার মনে পড়িল, কামদায় কুমীর ভাসিতে এ-গ্রামের কেহ কখন দেখে নাই, এমন কি সুদূরের জনশ্রুতি আসিয়াও এ-গ্রামের কানে কখন পেঁাছায় নাই। তবে ভয় কিসের ?

ঝপ্ করিয়া পাছে গভীর জলে পড়িতে হয়, এই ভয়ে অতি সন্তর্পণে পা বাড়াইয়া রতি হাঁটুজলে নামিল ; পাঁচুকে হাঁটুর কাছে টানিয়া লইল এবং এক হাতে তার ডানা ধরিয়া অন্য হাতে তার গা মাজিয়া দিল, দুই ডানা ধরিয়া তাহাকে ডুব দেওয়াইল, তারপর উপরে তুলিয়া গা মাথা মুছিয়া দিয়া পাঁচুকে বাড়ী পাঠাইয়া দিল।

রতি আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,—পাঁচু কৈ রে ?

রান্নাঘরের ভিতর হইতে ভারি গলায় পাঁচু বলিল,—খাচ্চি, বাবা।

—কেমন, কুমীরে নেয়নি ত ?

মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া পাঁচুও হাসিতে হাসিতে বলিল,—না।

নারাণী বলিল,—ছেলের আমার এতক্ষণে হাসি ফুটেছে।

সেইদিন বিকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া নারাণী বারান্দায় আসিতেই তাহাকে দেখিয়া পাঁচুরই সমবয়সী অনেকগুলি ছেলেমেয়ে বিদ্যুদ্বেগে অদৃশ্য হইয়া গেল। তাহাদের এই অকস্মাৎ পলায়নের হেতু নির্ণয় করিতে আসিয়া যে ব্যাপারের ভগ্নাবশেষ নারাণীর চোখে পড়িল তাহার তুলনা বুঝি কোথাও নাই।—নারাণী গালে হাত দিয়া একেবারে থ হইয়া গেল। হাঁকিল,—পাঁচু ?

পাঁচুর সঙ্গীরা বোধ হয় একদৌড়ে বাড়ী যাইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু পাঁচু তাহাদের দেখাদেখি ছুটিতে আরম্ভ করিলেও বাড়ীর সীমানার বাহিরে যাইতে পারে নাই। মায়ের ডাক্ শুনিয়া সে রান্নাঘরের আড়াল হইতে বাহির হইয়া অত্যন্ত জড়সড়ভাবে আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। ছেলের মূর্ত্তি দেখিয়া নারাণীর ব্রহ্মাণ্ড জ্বলিয়া উঠিল।

ব্যাপার এই—

নারাণী যখন ঘুমাইতেছিল তখন পাঁচু ও তার সঙ্গীরা ঘরে রাখা ছোট একটা পাকা কাঁঠাল চুরি করিয়া ভাঙ্গিয়া খাইয়াছে, কিন্তু কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া খাইবার ঠিক্ পদ্ধতিটা জানা না থাকায় ছেলে কাঁঠালের গাঢ়রসে সর্ব্বদেহ আপ্লুত করিয়া ফেলিয়াছে—তাহার উপর আনন্দের আবেগে উঠানের ধূলায় গড়াগড়িও দিয়াছে; কাজেই ছেলের মূর্ত্তি দেখিয়া মায়ের ব্রহ্মাণ্ড জ্বলিয়া উঠিবারই কথা!

অপরাধীগণের মধ্যে পাঁচুই একা ধরা পড়িয়া মায়ের রুষ্ট চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াই কাঁদিয়া ফেলিল।

পাঁচু মা'র খাইতে খাইতে বাঁচিয়া গেল—এত বেলা পর্য্যন্ত সে যে বড় ত্রাসের ক্লেশ সহ্য করিয়াছে; কিন্তু তার অকারণ আর্ত্তনাদে এবং নারাণীর ক্রুদ্ধ চীৎকারে রতির ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে বাহিরে আসিয়া গা-মোড়া দিয়া বলিল,—যেমন ছেলের গলা তেম্‌নি তার—হয়েছে কি?

নারাণী বলিল,—হয়েছে আমার শ্রাদ্ধ। চুরি করে' কাঁঠাল খাওয়া হয়েছে। ছেলের বিদ্যে কত! —বলিয়া সে এম্‌নিভাবে রতির দিকে চাহিল যেন চুরি করিয়া কাঁঠাল খাওয়াটা পুরুষজাতির মধ্যে অত্যন্ত ব্যাপক।

রতি ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল,—থামো, আর চেঁচিও না। আমি গিয়ে ধুইয়ে আনছি; তা' হলে' ত' হবে? বলিয়া সে উঠানে নামিল।

পাঁচুর হাতে খেলার একটা ঘট ছিল—সেইটি হাতে করিয়া অপরাধী পাঁচু চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে বাপের আগে আগে নদীর দিকে চলিল।...রতি তাহাকে জলে ফেলিয়া বেশ করিয়া রগ্‌ড়াইয়া ধুইয়া তুলিয়া আনিল। খানিকটা দূর উঠিয়া আসিয়া পাঁচু হঠাৎ থামিয়া বলিয়া উঠিল,—বাবা আমার ঘট?

উভয়েই ফিরিয়া দেখিল, জলের ধারেই ঘট পড়িয়া আছে।

পাঁচু আকুল হইয়া বলিল, —নিয়ে আসি, বাবা?

রতি বলিল,—যা।

পাঁচু হেট হইয়া ঘট তুলিয়া লইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে এমন সময় তাহারই একান্ত সন্নিকটে দু'টি সুবৃহৎ চক্ষু নিঃশব্দে জলের উপর ভাসিয়া উঠিল; পরমুহূর্ত্তেই সেস্থানের জল আলোড়িত হইয়া উঠিল, লেজ্‌টা একবার চমক্ দিয়া বিদ্যুদ্বেগে ঘুরিয়া গেল—এবং চক্ষের পলক না পড়িতেই পাঁচু জলে পড়িয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।...মুদ্রিতচক্ষু আড়ষ্টজিহ্ব ভয়ার্ত্ত রতির স্তম্ভিত বিমূঢ় ভাবটা কাটিতে বেশী সময় লাগিল না—পরক্ষণেই তাহার মুহুর্ম্মুহুঃ তীব্র আর্ত্তনাদে দেখিতে দেখিতে নদীতীর জনাকীর্ণ হইয়া উঠিল।......

দিবসের শেষে

যখন ওপারের কাছাকাছি পাঁচুকে পুনর্ব্বার দেখা গেল তখন সে কুম্ভীরের মুখে, নিশ্চল।...জনতা হায় হায় করিয়া উঠিল, পাঁচুর মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখের উপর সূর্য্যের শেষ রক্তরশ্মি জ্বলিতে লাগিল...সূর্য্যকে ভক্ষ্য নিবেদন করিয়া লইয়া কুম্ভীর পুনরায় অদৃশ্য হইয়া গেল।...কেবল পাঁচুর মা সে দৃশ্য দেখিল না।...সে তখন মূর্চ্ছিতা।—

পল্লী-শ্মশান

"কোহিনুর" ওয়াল্‌ল্যাম্পের শিখাটা একদিকে অতিরিক্ত বাড়িয়া উঠিয়া অনর্গল ধোঁয়া ছাড়িতেছিল, সেটাকে পরিমিত মাত্রায় কমাইয়া দিয়া পুনরায় আসন গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—তারপর, বাড়ী যাচ্ছ কবে ?

পূজার ছুটি আরম্ভ হইতে তখন মাত্র দু'দিন ছিল।

প্রশ্নের উত্তরে বসন্ত বলিল,---বাড়ী ? বাড়ী ত আমাদের নেই।

—বাড়ী নেই ?

—থাক্‌লে কি আর হৃদয় রজকের এই বাড়ীটা কিনি স্ত্রীর গায়ের গয়না বাঁধা দিয়ে ?

—নিজেদের দেশে তোমাদের বাড়ী নেই ? ছিলই না ?

—ছিল, কিন্তু এখন নেই !

—গেল কিসে ? বাকি খাজনায় ?

—না, না। গেছে মানে ভেঙ্গে গেছে, আর উঁইয়ে খেয়েছে কতক। বছর তিনেক হ'ল আমরা দেশ ছেড়ে বিদেশে স্থায়ী হয়েছি।

—পল্লীবাস একেবারে ত্যাগ করে ?—আমার কণ্ঠস্বরে একটু ভৎর্সনা ছিল।

বসন্ত হাসিয়া বলিল,—হাঁা, একেবারেই ত্যাগ করে। তার কারণ বড় সমস্যামূলক। শুনবে ?

—শুন্‌ব।

বসন্ত বলিতে লাগিল,---আমাদের গ্রামের দক্ষিণে মুসলমান, পশ্চিমে মুসলমান, পূবে নদী—ফাঁকা ; উত্তরে জঙ্গল, এক পাশে ভূতপূর্ব্ব দয়া বোষ্টমীর পরিত্যক্ত পঞ্চবটী, তারপর ব্রাহ্মণ আর নরসুন্দর, এই চৌহদ্দির মধ্যস্থিত কাঠা আষ্টেক ভূখণ্ডের উপর তিন ঘর বৈদ্যের বাস ছিল। উত্তরের জঙ্গলপারের ব্রাহ্মণরা একঘর ভেঙ্গে তিনঘরে দাঁড়িয়েছিলেন ; সেই তিন ঘরের দু'ঘর ডালে মূলে বহু পূর্ব্বেই নির্ম্মূল হ'য়ে গেছেন ; অবশিষ্ট একঘর ছিলাম আমরা, তাও পালিয়ে এসেছি। আমাদের বাড়ীতে থাক্‌তেন, অর্থাৎ বারমাস থাকতেন, দু'টি বউ, আমার বিধবা দিদি, আর এঁদের অভিভাবক ছিল চোদ্দ বছরের একটী বালক, কমল, আমার দিদির সৎছেলে।...নরসুন্দর রামগতি বিপত্নীক ও খোঁড়া, তার একখানা পা জন্মাবধিই শুকন আর খাটো, তার একখানা হাতও অকেজো, মানে পক্ষাঘাতে বিকল। তার ছেলেটি কালাজ্বরের রুগী, একেবারেই অচল। বৈদ্য তিনঘরের অবস্থা পরস্পরের তুলনায় এ-পিঠ আর ও-পিঠ।

বর্গাইতরা ফসলের অর্দ্ধেক বলে' একদশমাংশ যা' দিত তাতে তাঁদের জোড়াতালি দিয়েও দিন চ'লত না, তবে খরচের টাকাটা নিয়মিতই আস্‌ত আর যথেষ্টই আস্‌ত। এঁরা মোটের উপর সংখ্যায় পাঁচজন ছিলেন; সবাই রমণী; বিদেশগত পুরুষদের বিধবা ভগিনী, বিধবা ভাজ ইত্যাদি।—এঁদের তদ্বির তদারক ক'রত একটি ছেলে, খোকা, বয়স তের, মাঝের ঘরের নিস্তারিণীর ছেলে, বয়স হিসাবে নগণ্য আরও গুটিকতক ছিল। রমণী পাঁচজনের মধ্যে একটি মাত্র সধবা ছিলেন; তিনি যখন বিধবা হ'লেন তখনই গল্প জমে' উঠ্‌ল।

শিবদাসীর স্বামী, জিতেন বাবু, হঠাৎ একদিন আসাম থেকে আপাদমস্তক শোথ আর রক্তহীন পাণ্ডুরতা নিয়ে পৈত্রিক ভিটেয় প্রাণত্যাগ করতে এলেন। চিকিৎসার বাইরে তিনি অনেক আগেই চলে' গিয়েছিলেন; কিন্তু বাড়ীতে এসে তাঁর চিকিৎসা বন্ধ রইল চিকিৎসা নিরর্থক জেনে নয়, চিকিৎসক গ্রামে ছিল না বলেই। কয়েকটি মাদুলী ধারণ ক'রে জিতেন্দ্র অস্টপ্রহর হাঁপানীর টানে ধ্বস্‌তে' ধ্বস্‌তে' একদিন নেমে গেলেন। জিতেন্দ্র যখন মারা গেলেন বেলা তখন সাতটা। বিধবাদের স্বাভাবিক অবস্থাতে সাধ্যই হ'ত না মুমূর্ষুর অসাড় দেহ হাততোলা ক'রে নড়িয়ে রাখেন, কিন্তু ঘরের মধ্যেই মানুষ ম'রবে পারলৌকিক এই ত্রাসে তাঁদের শক্তি দশগুণ বেড়ে গেল। মুমূর্ষু জিতেন্দ্রনাথকে তাঁরা বাইরে আন্‌তে আন্‌তেই তাঁদের হাতের উপরেই তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ কর্‌লেন।

শোক যতবড়ই হোক্, সৎকারের আয়োজন করতেই হয়। মৃতদেহ শ্মশানে পাঠা'তে হিঁদুর বড় একটা ব্যগ্রতা দেখা যায়, বোধ হয় তার শাস্ত্রীয় কারণ আছে। এ দায়িত্বটা পুরুষের; এক্ষেত্রে পুরুষের অভাবে বাড়ীর মেয়েরাই শোকসম্বরণ করে' উঠ্‌লেন।......

কর্ত্তাদের আমলের কথাই মেয়েদের মনে ছিল; ইতিমধ্যে যে ভারতীয় হিন্দুমুসলমানের ঐক্য সংস্থাপিত হ'য়ে চুকে গেছে এ নূতন তথ্যটা তাঁরা অবগত ছিলেন না। কর্ত্তাদের আমলে বাড়ীতে মৃত্যু ঘটলে' সাহায্য ডাক্‌তে' হ'ত না, আপনি আস্‌ত'; এখন ডাক্‌তে হয়, এইটুকু তাঁরা জান্‌তেন। তাই সাহায্য ডাক্‌তে মুসলমান প্রতিবেশীর বাড়ীতে লোক গেল; খোকাই গেল। অনুরোধ জানাতেই এরফানরা তিন ভাই একসঙ্গে চম্‌কে উঠ্‌ল। খুব উঁচু জায়গা থেকে নীচে পড়্‌ছি স্বপ্ন দেখে মানুষ যেমন চম্‌কে উঠে তাদের চমকটাও ঠিক তেমনি প্রবল, হৃদ্‌কম্পজনক। অনুরোধটা ছিল এই যে তারা কেউ এসে সৎকারের কাঠের যোগাড় যদি করে' দেয়.........

এরফান বাড়ীর মাতব্বর; সে প্রশ্ন করলে,—তোমাকে'কে পাঠিয়েছে, খোকা?

খোকা বল্‌লে,—মা।

এর্‌ফান একটু হেসে বল্‌লে,—বাড়ীতে মড়া বলেই তিনি অচেতন হ'য়ে গেছেন। তাঁকে বলগে যাও, হিঁদুর মড়া আমরা ফেলিনে।

—তোমরা কেন ফেল্‌বে ? কাঠ—

বল্‌তে বল্‌তে খোকা চমকে উঠে থেমে গেল। এর্‌ফান গর্জ্জন ক'রে বল্‌লে,—ছোঁড়া ত বড় বাচাল হে। দুটোতে তফাৎ কি হ'ল ? কাফেরের মড়া পোড়াবার কাঠ আমরা যোগাইনে। যাও, বলগে তোমার মাকে।

এর্‌ফানের মনে মৌলভীর বক্তৃতার "কাফের"......প্রভৃতি কতক অংশ স্থিতিলাভ ক'রেছিল।

এর্‌ফানের ভাই তালেবর হেসেই বল্‌লে,—মাটি দাওগে, তোমরাই পার্‌বে।

খোকা কাঁদ কাঁদ মুখে বাড়ী ফির্‌লে নিস্তারিণী জিজ্ঞাসা কর্‌লেন,—এর্‌ফানরা কেউ এল না ?

—না।

—কি বল্‌লে ?

—বল্‌লে, মাটি দেওগে ব'লেই খোকা কেঁদে ফেল্‌লে।

খোকার কচি মন ঐ শেষ কথাটার গুরুত্ব কতদূর পৌঁছয় তা' উপলব্ধি ক'রেছিল কিনা তা' তার মনই জানে, কিন্তু পথে আস্‌তে আস্‌তে সে কথাটা মনে মনে বহুবার আবৃত্তি করেছিল সন্দেহ নেই ; বোধ হয় সহজবোধে সে ব্যথাও পেয়েছিল।

নিস্তারিণী কথাটা শুনে' বিস্ময়ে ব্যথায় একেবারে হতবাক্‌ বিবর্ণ হ'য়ে গেলেন। মধ্যাহ্নের সূর্য্য যেমন বালির উপর জ্বল্‌তে থাকে, মৃতের প্রতি এই হৃদয়হীন নিষ্ঠুর অপমানের জ্বালা তেমনি তেজে তাঁর শোকের উপর জ্বল্‌তে লাগ্‌ল। তাঁর মনে পড়্‌ল, বাবা যখন মারা যান তখন এই এর্‌ফানেরই পিতামহ তিন দিন তিন রাত্রি শয্যাত্যাগ করেনি ; ভাইফোঁটার দিন এর্‌ফানরা নেমন্তন্ন খেত' ; নিবিড় প্রণয়ের খাতিরেই এর্‌ফানের বসতবাড়ীর সাত কাঠা ভূঁই নিষ্কর।—

যাক্‌, সে সব কথা স্মরণ করে এখন লাভ নেই। যাদের সঙ্গে এত বাধ্যবাধকতা তাদেরই যখন মৃতের উদ্দেশে এমন কথা বল্‌তে বাধ্‌লো না তখন আর কার দরদের আশা করা যেতে পারে ?

নিস্তারিণী কিছুক্ষণ নিঃশব্দ থেকে সন্তাপটি পরিপাক ক'রে নিয়ে বল্‌লেন,—খোকা, তুই আর একবার যা। বল্‌গে, কাঠ না দিতে পার, দু'জন লোক ডেকে দাও, আর বিনোদপুরের সেনেদের একটা খবর দাও।

খোকা গেল।......

এর্‌ফান বিরক্ত হ'য়ে বল্‌লে,—মুসলমানকে দিয়ে ও কাজ হবে না, খোকাবাবু, কেন বৃথা হাঁটাহাঁটি ক'রে হয়রাণ হচ্ছ? আর বেগার দিতে আমরা দু'কোশ রাস্তা দৌড়তে পার্‌ব না। অধর্ম্ম ঢের ক'রেছি, আর না।

মৌলভী বলে গেছে, কাফেরের উপকার করাও মুসলমানের মহাপাপ, ধর্ম্মের নিষেধ আছে।

নিস্তারিণীর অন্তঃপুরে এ খবর পৌঁছয় নাই। তাই তিনি খোকাকে তৃতীয়বার পাঠালেন; বল্‌গে,—আমাদের বড় বিপদ, একটিবার তারা কেউ এসে দেখে যাক্‌। তারপর যা বল্‌বার হয় আমিই বল্‌ব। বলে তিনি সূর্য্যের দিকে চোখ তুলে বেলা দেখ্‌লেন কি ভগবানকে ডাক্‌লেন তা' তাঁর অন্তর্য্যামীই শুধু জান্‌লেন।

খোকা এসে বল্‌লে—তারা খেয়েই আস্‌ছে।

মৃতদেহ কিছুক্ষণ বাড়ীতে রাখার বিধি আছে; সেই নিরূপিত কালটা অতীত হ'য়ে গেছে। সুতরাং তারা আস্‌চে শুনে নিস্তারিণী ক্ষিপ্রহস্তে সব গুছিয়ে ফেল্‌লেন—ঘি, সোনার টুক্‌রো, রূপোর টুক্‌রোর বদলে একটা দু'-আনি, তিল, তাঁবা, কড়ি, পাঁকাঠি ইত্যাদি।

খোঁড়া রামগতি তার কালাজ্বরওয়ালা ছেলেটাকে সঙ্গে করে এসে নিজের অকর্ম্মণ্যতায় বড় কুণ্ঠিত হ'য়ে বসে' ছিল। সে উঠে এক হাতে এক পায়ে যথাসাধ্য সাহায্য করতে লাগ্‌ল; মুখাগ্নির পল্‌তে এক হাতে সেই পাকিয়ে দিলে।

বেলা বাড়্‌তে লাগ্‌ল। বস্ত্রাবৃত মৃতদেহের উপর রোদ পড়্‌ল। এর্‌ফানদের আসার ভরসায় তাঁরা আশ্বস্ত হ'য়েছিলেন, কিন্তু তারা আস্‌তে বড় দেরী কর্‌তে লাগ্‌ল। তারাই দাহনের কাঠ সংগ্রহ কর্‌বে, দু'ক্রোশ দূরের বিনোদপুর থেকে মৃতের স্বজাতিকে ডেকে আন্‌বে।......

একটি ঘণ্টার প্রতি মুহূর্ত্ত দুঃসহ উৎকণ্ঠার ভিতর দিয়ে কাটিয়ে নিস্তারিণী বিস্মিত এবং শঙ্কিত হ'য়ে খোকাকে এর্‌ফানের বাড়ীতে আবার পাঠালেন।

খোকা এসে বল্‌লে,—তারা ত কেউ বাড়ী নেই, মা!

শুনে' নিস্তারিণী আঁৎকে উঠ্‌লেন।—বাড়ী নেই? বলিস্‌ কি?

—তারা কোথায় গেছে বল্‌লে এর্‌ফানের বউ। রাত্তিরে আস্‌বে।

নিস্তারিণীর মাথায় বাজ ভেঙে পড়্‌ল। মানুষের মনের যে দিকটা আজ মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর সম্মুখে প্রকট হ'য়ে উঠল তা' যেমন আকস্মিক তেমনি মর্ম্মভেদী! এহেন প্রবঞ্চনার জন্য মানুষের মন প্রস্তুত হ'য়ে থাক্‌তেই পারে না—বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের মন, আর এই সময়। তাদের এই আসব বলে আশা দেওয়ার দানবীয় নির্ম্মমতার বুঝি তুলনা নাই।......

রামগতি ঘাড় হেট করে' বসে' ছিল, হঠাৎ সে চোখ তুলে দেখ্‌লে নিস্তারিণী বিস্ফারিত পলকহীন রক্তবর্ণ শুষ্ক চক্ষে তারই দিকে চেয়ে আছেন। নিস্তারিণীর এই ভয়ঙ্কর চাহনি যে তাঁর ব্যথায় অসাড় মনেরই প্রতিবিম্ব, তার আর কোনো অর্থ নাই, রামগতি তা' বুঝ্‌তে না পেরে কেঁদে ফেল্‌লে; বল্‌লে,—মা, আমি যে বড় নিরুপায়......

রামগতির কথায় নিস্তারিণীর যেন চমক্ ভাঙ্‌লো। বল্‌লেন,—খোকা তুই বিনোদপুর চিনিস্?

—চিনি।

—তবে তুই-ই যা।

—যাই। বলেই খোকা যেতে উদ্যত হ'ল।

নিস্তারিণী বল্‌লেন,—তোর যেতে আসতেই যে দুপুর গড়িয়ে যাবে।

রামগতি বল্‌লে,—তা' ত' যাবেই, মা। আমার পা থাক্‌লে আমি বসে' থাক্‌তাম না, মা। হা ভগবান!......

একখানি পায়ের উপর ভর দিয়ে একহাতে কুড়োল চালান' রামগতির পক্ষে যেমন অসম্ভব, তাড়াতাড়ি চলাফেরা করাও ঠিক তেমনি।

আমার ভাগ্‌নেটাও এসেছিল।

—খোকার সঙ্গে আমিও যাই?—বলে' সে খোকার পাশে গিয়ে দাঁড়ালে'।

নিস্তারিণী বল্‌লেন,—বাড়ীতে শুনে' এস।

—আচ্ছা। বলে' সে সুবোধ ছেলের মত বাড়ীতে শুন্‌তে গেল কিন্তু আর ফির্‌ল না। বোধ করি, দুপুরের কাঠফাটা রোদে অতটা পথ অনর্থক যাতায়াতের অনুমতি সে পেলে না।

আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করে' নিস্তারিণী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে ফেলে বল্‌লেন,—খোকা, তুই একাই যা।

খোকা গেল।

কান্না শোক ভুলে চারিটি নিরুপায় বিধবা, সৎকার বুঝি হয় না এই আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হয়ে বসে' রইলেন।......মৃতদেহের আবরণ শ্বেতবস্ত্রের উপর থেকে সূর্য্যের তেজ ঠিক্‌রাতে লাগ্‌ল;

যিনি মৃতদেহ স্পর্শ করে' বসেছিলেন তাঁর পিঠ রৌদ্রের তাতে ঝল্‌সে' কালো হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।......

মৃতদেহের এ দুরবস্থা আর চোখে সহ্য হয় না এম্‌নি অবস্থা হয়ে উঠ্‌ল! রামগতি বসেই ছিল, সে-ও উঠে' গেল; এ অবস্থায় তার অস্তিত্বের কোনই সার্থকতা নেই।...মধ্যাহ্নের সূর্য্য জ্বল্‌তে লাগ্‌ল, ততোধিক জ্বল্‌তে লাগ্‌ল উৎকণ্ঠায় তাঁদের অন্তর।......যদি খোকা বিনোদপুরের কাউকে না পায়; শুন্‌লে তারা নিশ্চয় আস্‌বে, কিন্তু যদি তারা বাড়ীতে না থাকে?......

ভয়ঙ্কর দৃশ্যের সম্মুখে চোখ যেমন আপনি বুজে' আসে, তাঁদের মনের ভাব্‌না ঐ পর্য্যন্ত এসেই অনন্তের মুখে তেম্‌নি করে' থেমে নিশ্চল হ'য়ে গেল।—

শিবদাসী মৃত স্বামীর গায়ের উপর ডান হাতের স্পর্শ রেখে নড়ে' বসে বল্‌লেন,—কাঠের কি হবে, দিদি?

নিস্তারিণী বল্‌লেন, —আর ভাব্‌তে পারছিনে, বৌ। ভগবান জানেন কি হবে।

তারপর আবার সব নিঃশব্দ।

খোকা যখন বিনোদপুরের তিনটী লোককে সঙ্গে নিয়ে উঠনে এসে দাঁড়াল' তখন তার মুখের দিকে চেয়েই নিস্তারিণী তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিলেন।...সূর্য্যদেব যেন তাকে রোদে ভেজে' এইমাত্র ছেড়ে দিয়েছেন, তার দেহের সমস্ত রক্ত তার মুখের ত্বকের নীচে এসে জমেছে, ওষ্ঠাধর তার এম্‌নি বিশুষ্ক যেন একটু পরেই তা' শুক্‌ন' মাটির মত ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। কিন্তু জীবিতের প্রতি মায়া মমতায় আহা উহু কর্‌বার সময় তখন কারু ছিল না।

বান্ধবত্রয়ের একজন বিশ্রাম করতে করতে বল্‌লেন,—কাঠের যোগাড় হয়েছে ত? খোকা বল্‌ছিল হয়নি'।......

নিস্তারিণীর চোখে পুনরায় জল দেখা দিল, এবং দেখা দিয়েই ঝর ঝর্‌ করে ঝরতে লাগ্‌ল। শব্দহীন বৃহৎ বাড়ীটা এতক্ষণ যেন দুনিয়া থেকে বৃন্তচ্যুত হয়ে নিঃশব্দ প্রেতভূমির মত থম থম্‌ করছিল,—শুধু একটা দাঁড়কাক মাঝে মাঝে চালের উপর উড়ে এসে বিশ্রী কর্কশকণ্ঠে অবিশ্রান্ত কা কা করছিল, অলক্ষণে' জেনেও সেটাকে হাত তুলে' তাড়াবার উৎসাহ পর্য্যন্ত কারু অবশিষ্ট ছিল না। দুস্তর বিপদের সম্মুখে তাঁদের ভয়ার্ত্ত নিরাশ্রয় মনের শোক করবার শক্তি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল; এখন উদ্ধারকর্ত্তার প্রশ্নে তাঁদের মন আশ্রয় পেয়েই হু হু করে' উঠ্‌ল।

কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে নিস্তারিণী বল্‌লেন,—না বাবা, কাঠের যোগাড় হয় নি'।

—সেটাও কি আমাদেরই করতে হবে ?

এই প্রশ্নটিই বন্ধুর জিহ্বাগ্রে এসে পড়েছিল, কিন্তু তিনি সাম্‌লে নিয়ে প্রশ্নের পরিবর্ত্তে ভ্রূভঙ্গী কর্‌লেন। নিস্তারিণী সে ভ্রূভঙ্গী দেখে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আঁচলে চোখের জল মুছে' ফেল্‌লেন।

দ্বিতীয় বন্ধুটি ভাইপোর রূঢ় ব্যবহারে লজ্জিত হয়ে বল্‌লে,—কুড়োল দাও ত, খোকা, কাঠের যোগাড় ক'রে নিচ্ছি।

তারা উদ্যোগী হ'য়ে গেল বটে, কিন্তু কুড়োল চালা'তে যে অভ্যস্ত কৌশলের দরকার তা' তাদের ছিল না : কাজেই কুড়ি বাইশটি গাবের চারাগাছ ভূমিসাৎ করেই বোধ হয় ক্লান্তিবশতঃই তাদের মনে হল, যথেষ্ট হয়েছে।

তারপর সমস্যা উঠ্‌ল, প্রচুর হোক্ অপ্রচুর হোক্, কাঠ শ্মশানে নেবার উপায় কি ?

আগে এমন দিনে কাঠ নৌকয় যেত'। এরফানরা অথবা তাদের মতই অনুগত যারা তারাই গাছ কেটে কাঠ করে' নৌকয় বোঝাই দিয়ে শ্মশানে পৌঁছে দিত। কিন্তু এখন তারা নারাজ, ধর্ম্মভীরু হয়েছে।

গণনীয় লোকের মধ্যে খোকাকে নিয়ে চারটি। দু'জনে শব বহন করলেও তৃতীয় একজন কাঁধ দেবার উপযুক্ত লোক হাতের কাছেই থাকা দরকার, বিশেষতঃ শ্মশান যখন হাঁটা পথে দেড় মাইল দূরে। বিনোদপুরের তিনজন গেল বহনের কাজে, বাকি রইল খোকা। তাকে দিয়ে কাঠ টানানো অসম্ভব।

নিস্তারিণী পুনরায় খোকাকে বল্‌লেন,—যা ত', বাবা; আর একবার দেখে আয় এরফানরা কেউ বাড়ী এসেছে কিনা।

খোকা গেল, এবং কিছু বিলম্বে ফিরে এসে বল্‌লে,—তারা বাড়ী এসেছে : কিন্তু এ বাড়ীতে আস্‌তে তারা পারবে না। বল্‌লে, হিঁদুর মড়ার কাঠ বইলে আমাদের জাত যাবে।

মৌলভী সাহেবের অনুজ্ঞা যেমন অভ্রান্ত তেমনি পালনীয়—তাই তারা অক্ষরে অক্ষরে তা' পালন করতে চায়।

ব্যাপার যখন এমনি সঙ্গিন, সৎকার বুঝি হয় না ;—উপায়হীন অন্ধকার অপার দুঃখের নিষ্পেষণে নিস্তারিণীর নিঃশ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে যাবার উপক্রম হ'য়েছে, এমন সময় ভগবান দয়া কর্‌লেন। রামগতি তার শ্যালককে নিয়ে মূর্ত্তিমান জনার্দ্দনের মতই এসে উপস্থিত হ'ল। শ্যালক জনার্দ্দন ভগ্নিপতির বাড়ীতে বেড়াতে এসেছে। সমুদয় কাঠ শ্মশানে পৌঁছে দেবার ভার সে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে গ্রহণ কর্‌লে।

শব আর কাঠ যখন শ্মশানে এল তখন রোদ পড়ে' এসেছে, বেলা তখন প্রায় সাড়ে পাঁচটা। চিতা সাজাতে সাজাতে অন্ধকার হ'য়ে এল।

চিতা জ্বালা হ'ল, কিন্তু মুস্কিল অত্যন্ত দুর্ব্বার হ'য়ে উঠ্‌তে লাগল ঐ দেহটাকে নিয়েই। ......শোথের রুগী, সর্ব্বাঙ্গ ছিল তার জলপূর্ণ, আগুনের আঁচ লেগে জল প্রথমে ফোঁটায় ফোঁটায় চুঁইয়ে শেষে সোঁ। সোঁ। শব্দে গড়াতে সুরু কর্‌ল। চিতা নিবে গেল। বার বার অল্প সময়ের জন্য জ্বলে', বার বার ধোঁয়া হ'য়ে নিবে গিয়ে কাঠ যখন নিঃশেষ হ'য়ে ফুরিয়ে গেল তখন মৃতদেহ একেবারে অক্ষত, শুদ্ধমাত্র গায়ের চাম্‌ড়া তার কালো হয়ে গেছে।

দাহনকারীরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগ্‌ল, তাতে শুধু সময়েরই অপব্যয় হ'তে লাগ্‌ল, আসল কাজ এগলো না।

নিস্তারিণীর বাড়ীতে পা দিয়েই যে-ব্যক্তি ভ্রূভঙ্গী করেছিল, সে বল্‌লে,—এক কাজ করা যাক্‌—

কিন্তু কাজের কথাটা বল্‌তে গিয়েও সে বল্‌তে পারল না; তাকে থেমে যেতে হ'ল। তার মানে আছে। সংস্কার বড় কঠিন বস্তু; অতীত যুগযুগান্তরের মধ্যে তার জন্ম, পুরুষ পুরুষান্তরের অটুট নিষ্ঠার মধ্যে তার মূল, পাষাণস্তম্ভের মত তা' অটল অবস্থায় নেমে এসেছে। এই সংস্কারের বাধা পেয়েই তার কথা আট্‌কে' গেল, কিন্তু কথাটা শেষ কর্‌লে রামগতির শ্যালক জনার্দ্দন। সে বল্‌লে,—বাবুর মনের ভাব আমি বুঝেছি। তাই করা যাক্‌।

বাবুর মনের কথা সে বুঝেছিল কি না তা' তার ঈশ্বর জানেন; তবে সে গা-মোড়া দিয়ে আলিস্যি ভেঙ্গে উঠে' দাঁড়াল'।—তার চোখের ইঙ্গিতে বাবুরাও উঠ্‌লেন। বিশ্রামের জন্য পেতে বস্‌তে যে বস্তাটা আনা হয়েছিল তারই অর্দ্ধেকটা জনার্দ্দন বালি তুলে' বোঝাই করে' ফেল্‌লে। মৃতদেহ চিতার উপর থেকে নামিয়ে তার কোমরের সঙ্গে সেই বস্তাটা বেঁধে সবাই মিলে তাকে নদীর জলে ছেড়ে দিলে। বালির ভারে মৃতদেহ ডুবে' গেল। তারপর উচ্চৈঃস্বরে একবার হরিধ্বনি করে' শ্মশানবন্ধুরা যে যার ঘরে গেল।......

মকরবাহিনীর শবসাধনার প্রয়োজন ছিল না; তিনি সে মৃতদেহ ঠেলে জলের উপরে তুলে' দিলেন। বস্তার মুখ বাঁধা হয়েছিল অত্যন্ত অসাবধানে, বস্তার স্থানে স্থানে ছেঁড়াও ছিল; কাজেই শূন্য বস্তাসহ মৃতদেহ ভেসে উঠ্‌তে দেরী হ'ল না।

* * * *

পরদিন সকালে বেলা অনুমান ন'টার সময় নিস্তারিণী নদীর ঘাট থেকে পাগলের মত আলুথালু হ'য়ে ছুট্‌তে ছুট্‌তে বাড়ী এসে মৃত ভ্রাতার নাম ধরে একটা চীৎকার করে মাটিতে আছ্‌ড়ে' পড়লেন, —এমনি তীব্র সে আর্ত্তনাদ যে মনে হ'ল, শব্দের বেগে নিস্তারিণীর কণ্ঠ আর

আকাশ একসঙ্গেই বিদীর্ণ হ'য়ে গেছে। শূল বেদনায় পেটের ভিতরটা মোচড়াতে থাক্‌লে মানুষ যেমন লোটায় নিস্তারিণী তেমনি ক'রে উঠনে পড়ে' লোটাতে লাগলেন। আর যাঁরা ছিলেন তাঁরা শশব্যস্তে ছুটে এলেন।

—কি হ'য়েছে?—জিজ্ঞাসা করতেই তিনি উঠে বসে' হাত দিয়ে চোখ আড়াল করে বল্‌তে লাগ্‌লেন,—আমি জানিনে, আমায় কেউ তোরা কিছু জিজ্ঞাসা করিস্‌নে; তোরা কেউ ঘাটে যাস্‌নে।......

বহু ব্যগ্র প্রশ্নের উত্তরেও নিস্তারিণী পুনঃপুনঃ কেবল ঐ একই কথা বল্‌তে লাগ্‌লেন,—

—ওরে, তোরা কেউ ঘাটে যাস্‌নে। আজ না, কাল না, কোনো দিন না।......

কিন্তু তাঁর এ নিষেধ কেউ মান্‌লে না। দু'তিন জনে ঘাটে গিয়ে যে দৃশ্য দেখে এল তা' যেমন শোচনীয় তেমনি অকথ্য।......জিতেনের মৃতদেহ ভেসে উঠে ভাস্‌তে ভাস্‌তে এসে নদীর দুইতীরে এত স্থান থাক্‌তে তাঁদেরই ঘাটে লেগেছিল: শেয়াল কুকুরে তা' ডাঙ্গায় টেনে তুলেছে, শকুন নেমে এসেছে, কাক জুটেছে: শকুন, শেয়াল, কুকুর, কাক ঝাপ্‌টাঝাপ্‌টি কাড়াকাড়ি ক'রে সেই দেহ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে।—

পরমাত্মীয়ের মৃতদেহের কল্পনাতীত এই বীভৎস পরিণামে বিধবাদের চোখের জল আর থাম্‌তে চাইল না; তার মৃত্যু সহ্য হ'য়েছিল, কিন্তু তার দেহের এই দুর্ভাগ্য বুকে সইল না। এ দুঃখ যে মানুষের কতবড় দুঃখ তা' কল্পনা করাও বুঝি অসম্ভব, তার বুঝি সীমা নাই; বুকে কতখানি শক্তি থাক্‌লে তবে মানুষ এই দুঃখে বিকল হয় না বল্‌তে পার?

আমি বলিলাম,—না।

বসন্ত বলিতে লাগিল,—হিঁদুর সব সহ্য হয়, দেহকে সর্ব্বপ্রকারে পীড়িত করে নিজেকে সে অশেষ দুঃখ অক্লেশে দিতে পারে,—উপবাসে, অনিদ্রায়, তপস্যায়, পুণ্যের লোভে। তার কল্পনাও সর্ব্বদা সুশীল নিরীহ নয়, কিন্তু নিজের প্রাণহীন দেহের এ দুর্গতির কল্পনাও সে করতে নারাজ; অত্যন্ত ব্যথার স্থানে আঙ্গুলের চাপের মত হিঁদুর মনের উপর এ কল্পনার স্পর্শও অসহ্য। আকাশস্থ আত্মা ক্লেশ পায়, তার গতি হয় না।......

বসন্ত থামিল।

আমার বুকের ভিতর দুর্‌দুর্‌ করিতেছিল। বলিলাম,—তারপর?

—তারপর মেয়েদের কাছে গ্রামের মাটি বিষের মত হ'য়ে উঠ্‌ল। কান্নাকাটি করে তাঁরা যে যাঁর আত্মীয় জ্ঞাতি বন্ধুর কাছে পালা'লেন; একটি মাসের মধ্যে গ্রাম হিন্দুশূন্য হ'য়ে গেল।

শুনেছি, সেই দেহ যেখানে শেয়াল শকুনে খেয়েছিল, ঠিক তার সোজা ওপারে এখন ওপারের গাঁয়ের শ্মশান!

ভরা-সুখে—

বাড়ীতে আজ মহাসমারোহ—

মা অন্নপথ্য করিবেন।

রত্নগর্ভা বলিতে যা বুঝায় হরিমোহিনী ঠিক্ তাই। যে ভাগ্যদেবতা নারীর গর্ভে সুসন্তান দিয়া তাহাকে সার্থক করিয়া তোলেন তিনি হরিমোহিনীর প্রতি সুরু হইতেই সুপ্রসন্ন। হরিমোহিনীর সাতটি সন্তান, তার মধ্যে একটি মেয়ে।

এ-কথা বলিতেছি না যে মেয়ে রত্ন নয়, মেয়েও রত্ন—তবে তাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন বলিয়াই তাকে রত্ন জ্ঞান করিয়া মা নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করেন না।—ছ'টি ভাইয়ের চোখে বোনটি রত্নই; বোন্ কাছে আসিলে ভাগের সংখ্যা দেখিয়া আর ভাণ্ডারের দিকে চাহিয়া ভাইদের শঙ্কিত হইয়া উঠিবার কারণ নাই।—

হরিমোহিনীর পাঁচটি ছেলের মাসিক আয় ছ'হাজারের উপর; কেউ উকিল, কেউ ডাক্তার, কেউ ইঞ্জিনীয়ার—এবং সবাই বড় পর্য্যায়ের। ছোটটি শিক্ষায়তনের চূড়া ডিঙ্গাইয়াও বাড়ীতেই থাকে; সে বক্তা ভাল; কথার খোঁচায় চাষার ট্যাঁক ছিঁড়িয়া খাজ্না ইস্রাল তাহারই কাজ।

পাঁচটি ছেলে বিদেশে থাকে।

মায়ের হাতে টাকা নাই তবু ছেলেরা মাতৃভক্ত। অন্নপ্রাশন হইতে আরম্ভ করিয়া দুর্গোৎসব পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ কোনো ব্যাপার হরিমোহিনীর অমতে বা অনিচ্ছায় আজ পর্য্যন্ত একটিও সাধিত হয় নাই। বৌরাও তেম্নি—মা বলিতে অজ্ঞান। ছ'টি ছেলের চয় চক্ ছত্রিশটি অর্থাৎ বহুসংখ্যক ছেলেমেয়ে লইয়া গাঙ্গুলীদের প্রকাণ্ড সংসার—সবার উপরে মা। অপার করুণা, অনন্ত শ্রী, অসীম ধৈর্য্য, অতুল আনন্দ, অজস্র কল্যাণ লইয়া মা মাথার উপরে বিরাজ করিতেছেন—অনুগত ভৃত্যের মত সংসার তাঁর আজ্ঞাবহ!······

ছেলেরা বলিয়া দিয়াছে,—তোমার আর কোনো কাজ নেই, মা; তুমি কেবল আদেশ ক'রবে।

মায়ের আদেশ একটিও লঙ্ঘিত হয় নাই।

এই হরিমোহিনী অসুখে পড়িয়াছিলেন, বাঁচিবেন এ আশাই ছিল না; অতি কষ্টে রক্ষা পাইয়াছেন; আজ তিনি অন্নপথ্য করিবেন।······

সূত্রপাত অতি সামান্য —সামান্য একটু সর্দ্দি, সামান্য একটু খুস্ খুস্ কাশি, সামান্য অরুচি ; হরিমোহিনী গ্রাহ্যও করিলেন না ; আহার কমিলেও আহ্নিকের খাতিরে স্নান নিয়মিতভাবেই চলিতে লাগিল।……ছোট বৌ নিরুপমা একবার ঢোক গিলিয়া একটু নিষেধের সুরে বলিল,—নাওয়াটা দু'দিন বাদ দিলে হয় না, মা ? যদি অসুখ বেশী হ'য়ে পড়ে !

হরিমোহিনী হাসিয়া বলিলেন,—বেশী হ'য়ে পড়্লে তোমরা আছ, দেখ্বে।

শুনিয়া নিরুপমা অবাক্ হইয়া গেল। যার দেখিবার লোক আছে তাহার অসুখ বাড়িতে দিতে হইবে !—

পুত্রবধূর নিষেধ অমান্য করা চলে, সে প্রতিশোধ লয় না, কিন্তু প্রকৃতির হাত অনিবার্য্য—সে প্রতিশোধ নিল।……

একদিন হরিমোহিনী পূজার ঘর হইতে কাঁপিতে কাঁপিতে বাহির হইয়া আসিয়া সম্মুখেই নিরুপমাকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—আমার বুঝি জ্বর এল, বৌমা। আমায় ধর।

নিরুপমা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া শুয়াইয়া দিল।……

কবিরাজ আসিলেন।

বলিলেন,—যা' হোক্, ভয়ের কারণ নেই ; তবু সবাইকে খবরটা দিয়ে রাখুন ; প্রাচীন মানুষ কি না।……

খবর পাইয়াই ছেলেরা ছুটিয়া আসিল।

আরো তিন দিন গেল —অসুখ বাড়িল না, কমিলও না। কিন্তু কবিরাজ হঠাৎ অনুমতি দিলেন—যা' খেতে' চান্ তা-ই দিতে পারেন।

শুনিয়া ছেলেদের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

কবিরাজ তাড়াতাড়ি বলিলেন,—না, না, সে ভয় ক'রবেন না। অরুচিটা আছে কি না, আহারে রুচি না এলে ত' দুর্ব্বল হ'য়েই মারা যাবেন ; রুচিটা আন্তেই হবে।—

কিন্তু কোনো খাদ্যই হরিমোহিনীর মুখে রোচে না—আহারে তাঁর বড় অনিচ্ছা।

ফলমূলের ঝুড়িতে বাড়ী বোঝাই হইয়া গেল।

হরিমোহিনী বলিলেন,—রস খাইয়ে তোরা বাঁচাতে চাস্ ! পাগল তোরা ! আমার ডাক্ এসেছে, যেতে দে। বলিয়া তিনি প্রাণপণে মুখ বন্ধ করিয়া রহিলেন।—

—এই রসটুকু খাও মা, একটুখানি এইটুকু দুধ, খেয়ে ফেলো, মা।……ছেলে আর বৌদের এমনি সহস্র কাকুতি নিস্ফল হইয়া গেল —হরিমোহিনী কোনো খাদ্য মুখে লইলেন না।

শুধু জল আর জল !—

মুহুর্মুহুঃ মুখে জল দিতে হইতেছে; প্রতিবারই হরিমোহিনী প্রশ্ন করিতেছেন, গঙ্গাজল ত' ?

পনর দিনের দিন কবিরাজ হরিমোহিনীর নাড়ীর উপর আঙ্গুল রাখিয়া মিনিট তিনেক পরে মুখ অন্ধকার করিয়া ফেলিলেন। —নাড়ী কখনও পাওয়া যাইতেছে, কখনও পাওয়া যাইতেছে না।......

আড়ালে যাইয়া কবিরাজ বলিলেন,—আজ রাতটা সাবধানে থাক্‌বেন।

—সে কি ? বলিয়া ছেলেরা চমকিয়া শুকাইয়া উঠিল।

—নাড়ী বড় এলোমেলো। আমার সঙ্গে লোক দিন। বলিয়া কবিরাজ বাহিরে আসিলেন।

কিন্তু সে-রাত্রি হরিমোহিনীর কাটিল—

পরদিন প্রাতঃকালে কবিরাজ তাঁর নাড়ী দেখিয়া মুখ তুলিয়াই দেখিতে পাইলেন, এতগুলি মানুষ তাঁহারই মুখের দিকে নিষ্পলক চক্ষে চাহিয়া মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া আছে ; কবিরাজ বুঝিতে পারিলেন, উৎকণ্ঠায় এই সব স্ত্রী পুরুষ বালক যুবার প্রাণ এমনই কণ্ঠাগত যেন তাঁহারই উচ্চারিত বাক্য দণ্ডাজ্ঞার মত এই মুহূর্ত্তেই তাদের মারিবে কি বাঁচিতে দিবে।

কবিরাজ চোখের ইসারায় বড় ছেলে গঙ্গাধরকে ডাকিয়া বলিলেন,—নাড়ীর অবস্থা ভাল, আশা হ'য়েছে।

কথাটা মর্ম্মে গ্রহণ করিয়া গঙ্গাধর উঠিয়া দাঁড়াইতেই তার মুখের আভায় যেন দিক্ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, এবং যে পুলকের একটা অতি স্নিগ্ধ ধারা সেই অবরুদ্ধশ্বাস চরম উদ্বিগ্ন প্রাণিগুলির প্রাণের উপর বর্ষিত হইয়া গেল তাহার পরিমাণ নাই, তুলনা নাই।

হরিমোহিনী সুস্থ হইয়া উঠিতে লাগিলেন, এবং পথ্যে রুচি ফিরিল।

আজ তাই বাড়ীতে এত সমারোহ —অসুখের পর মা প্রথম অন্নপথ্য করিবেন।

কবিরাজ বলিয়া দিয়াছেন,—একতোলা অত্যন্ত পুরণো চাল আধঘণ্টা সিদ্ধ করে সেই ভাত একতোলা দুধের সঙ্গে মিশিয়ে তরল করে' দিতে হবে।—

এই হইবে মায়ের অন্নপথ্য, কিন্তু আয়োজন হইয়াছে একটা যজ্ঞের। বধূরা সবাই আজ স্বতন্ত্রভাবে রাঁধিয়াছে......

নিরামিষ ব্যঞ্জন—তিত', ঝাল, মিষ্টি—যাহার যাহা জানা ছিল সব প্রস্তুত হইয়াছে।

মেয়ে নিপুণাও রাঁধিয়াছে।

মা এত খাইবেন না—রাঁধিয়া শুধু তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে দিবার আনন্দের লোভে বধূরা একটি বেলার জন্য পরস্পর পৃথক হইয়া গেছে। জানা ছিল, প্রসবগৃহ হইতে বাহির হইবার পর যাহারা গঙ্গাস্নান না করিয়াছে হরিমোহিনী তাহাদের রান্না খান না। মেজ আর ন' বৌ এদিক্ দিয়া অশুচি ছিল; তাহারা তাড়াতাড়ি নৈহাটি যাইয়া গঙ্গায় ডুব দিয়া আসিয়াছে।—

পথ্য প্রস্তুত করিল বড়বৌ নিজে।

হঠাৎ একটা গোলমেলে প্রশ্ন উঠিল, মায়ের মুখে পথ্য দেবে কে?……

অনেক মান অভিমান, কান্নাকাটি, রেষারেষি, ইচ্ছা, আবদার, নালিশ, সালিশের পর বড়বৌ নিপুণার দিকেই গড়াইলেন। নিপুণা বারমাস মায়ের কাছছাড়া হইয়া থাকে, কাজেই তাহাকেই এই দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারিণী করা হোক্।—রায় শুনিয়া অনেকের চোখেই জল আসিল।

ছোটদের মধ্যে কে একজন ইস্কুলের অভ্যাসবশতঃ বলিয়া উঠিল,—লটারি হোক্।

কিন্তু এমন সুসঙ্গত প্রস্তাবটা কোলাহলের মধ্যে নিজের ঠাঁই পাইল না।

পথ্য প্রস্তুত হইয়াছে।—

ছেলেরা, বউরা, নাতি, নাতনী, নাতবৌ, সবাই স্নান করিয়া আসিয়াছে; হরিমোহিনীর ঘরের ভিতর পুরুষদের এবং আড়ালে বারান্দায় মেয়েদের আহারের ঠাঁই হইয়াছে: বৌরা পাথরের থালায় ভাত এবং অসংখ্য পাত্রে অসংখ্য নিরামিষ ব্যঞ্জন তুলিয়া থালার চতুর্দ্দিকে সাজাইয়া দিয়াছে।—সেইদিকে চাহিয়া আর বধূদের দিকে চাহিয়া হরিমোহিনী ছলছল চক্ষে হাসিতে লাগিলেন—এত সুখ যে মানুষের ভাগ্যে কেমন করিয়া ঘটিতে পারে তাহাই যেন তাঁর ধারণায় আসিল না।—

মা পথ্য গ্রহণের পর সেই উচ্ছিষ্ট পাত্রের স্পর্শ দিয়া সমস্ত অন্ন ব্যঞ্জন মায়ের প্রসাদ করিয়া লওয়া হইবে; পুরুষেরা মায়ের চোখের সম্মুখে বসিয়া আগে সেই প্রসাদ গ্রহণ করিয়া পরে যথারীতি ভোজন করিবে।—

নিপুণা কাপড় ছাড়িতে গেল।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা হরিমোহিনীর বিছানার চতুর্দ্দিকে সারি সারি বসিয়া গেল, বৌয়ের দল প্রাচীনত্বের ক্রম হিসাবে সাজাইয়া বসিল—যার যার কোলে ছেলে ছিল না, তারা যার তার একটাকে টানিয়া লইল।……

বালিশের ঠেস্ রাখিয়া হরিমোহিনীকে অতি সন্তর্পণে একটু তুলিয়া বসাইয়া ছেলেরা তাঁর অদূরে বসিল। হরিমোহিনী সকলের মুখের দিকে একবার চাহিয়া তৃপ্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ক্লান্তিভরে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

নিপুণা গরদ পরিয়া আসিল।

পথ্যের পাত্রটা হরিমোহিনীর মুখের কাছে লইয়া নিপুণা ডাকিল, —মা!

গঙ্গাধর ঝুঁকিয়া ডাকিল,—মা, পথ্য কর।

মা কথা কহিলেন না।

ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন ভাবিয়া গঙ্গাধর উচ্চতর কণ্ঠে ডাকিল,—মা ?

মা তথাপি নীরব। –

গঙ্গাধর চমকিয়া উঠিল। –হেঁট হইয়া সে হরিমোহিনীর বাঁ হাতখানা তুলিয়া লইল; ঘর একেবারে নিঃশব্দ, নিঃশ্বাসের শব্দটুকুও নাই।······হরিমোহিনীর নাড়ীর উপর গঙ্গাধরের আঙ্গুল কাঁপিতে লাগিল, এবং তখনই সে—"মা ত নেই"—বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া মায়ের কোলের উপরেই লুটাইয়া পড়িল—

পরক্ষণেই মা মা আহ্বানে আর আর্ত্তনাদে গৃহ পূর্ণ হইয়া উঠিল।—

মা প্রসন্ন হাসিমুখে নীরব রহিলেন।



এইবার লোকে ঠিক্ বলে-

চিরদিনই এমন ছিল না -

মা, স্ত্রী ও তিনটি দুগ্ধবতী গাভী লইয়া পল্লীপ্রান্তে শিবপ্রিয় সুখেই ছিল।

মা পোয়াতির কাঁথা শেলাই করিয়া দেয়; আজুরা বার আনা, একটাকা, আঠার আনা; ঘর লেপিয়া, ঘুঁটে দিয়া দেয়, দুইবেলা খাইতে পায়। স্ত্রী নিত্য গৃহস্থের ধান ভানিয়া দেয়—বিশ্ সেরে দু'সের তার পারিশ্রমিক।... .. তিনজনে প্রাণপণে গরু তিনটির সেবা করে; তারাই লক্ষ্মী। দুধ লইয়া শিবপ্রিয় বাজারে বেচিয়া আসে; খড়, ভূঁষি, ঘাস, বাগান-কুড়ান জ্বালানি কাঠ অদূরের টাউনে লইয়া বেচে।...... ....

এমনি করিয়া তিল কুড়াইয়া তারা তাল করে।

দিন চলে।.

পথের দিকে চাহিয়া কি দেখিয়া শিব মুখ টিপিয়া হাসে।.....নিত্য তার নিটোল দেহ দুলাইয়া কল্সী কাঁখে জল আনে; জলের কল্সী দাওয়ায় নামাইয়া হাঁফ্ ছাড়ে; কাঁখালের সিক্ত স্থানটায় কাপড়ের ভিতর দিয়া ত্বকের কাঞ্চন আভা ফুটিয়া ওঠে -

সেই দিকে একবার অলক্ষ্যে চাহিয়া লইয়া শিব বলে,—আছি বেশ।

নিত্য বলে,—নিত্যিই ত শুনি; এখন, অদৃস্টে টি'কলে বাঁচি।

টিক্ টিক্ করিয়া টিক্‌টিকি ডাকে।

—বরাত্। বলিয়া শিব বলে, —দোনাটা কই? আজ দুধ আর বাজারে নেব না, নিত্য। খাব।

—মা কই?

—কোন্ বাড়ী কাঁথা দিতে গেল।

নিত্য দোনাটি আগাইয়া দেয়, কিন্তু শিবপ্রিয়র গরু দোহাইবার গরজ দেখা যায় না।—

নিত্য চৌকাঠে জলের ছিটা দিয়া ঘরে ঘরে, তুলসীতলায় সন্ধ্যা দেখাইয়া ফেরে; তার অতুলন গঠনসুষমার দিকে চাহিয়া শিবপ্রিয়র কেমন নেশা ধরিয়া যায়; মুহুর্মুহুঃ দুজনার চোখোচোখি হয়, মুহুর্মুহুঃ হাসি ফুটিয়া মুখময় ছড়াইয়া পড়ে।

নিত্য তাগিদ্ দেয়,—নেও, ওঠো, সন্ধ্যে যে বয়ে গেল, গরু দুইতে হবে না নাকি আজ?

---

* "চুন্ চুন্ সএ হমারে মরী ঐ"—নামে কালি-কলমে প্রকাশিত।

—সে হবে'খন্। বলিয়া শিব নিজ্জীবের মত বসিয়া থাকে। বলে,—আছি বেশ।

নিত্য হাতের প্রদীপটি তুলিয়া ধরিয়া উঠানের মাঝখানেই দাঁড়াইয়া পড়ে; হাসিয়া বলে,—কে নেই শুনি?

—অটল নাপিত নেই, জগাই ঘোষ নেই, সুদাম পাল নেই। আর বল্‌ব? তাদের বৌ—

প্রদীপটি হঠাৎ টানিয়া লইয়া নিত্য চলিয়া যায়; মনে মনেই ঠোঁট্ ফুলাইয়া বলে,—বৌ সুন্দর, সেই গরবেই দিনরাত আটখানা।—

দিন চলে।

হঠাৎ একদিন "বম্ মহাদেও" বলিয়া "বিরাশী দশ-আনা" ওজনের এক হাঁক্ ছাড়িয়া সশিষ্য এক সন্ন্যাসী সেনেদের পুকুরপাড়ে আসিয়া লিচু গাছের নীচে আড্ডা জমাইয়া বসিলেন।

এক নিমেষেই যারা সাধুর পদপ্রান্তে ভিড়িয়া গেল শিবপ্রিয় তাহাদের অন্যতম। সন্ন্যাসীর খড়মের বোলে' হইতে সুরু করিয়া চূড়া করিয়া বাঁধা ঐ জটাদাম পর্য্যন্ত সবই অপার্থিব, এবং উহাদেরই কোথাও ঐহিক সিদ্ধি এবং পারত্রিক মোক্ষ বিতরণ করিবার জন্যই একত্র করিয়া রাখা আছে এই বিশ্বাস যে কেমন করিয়া গ্রামস্থ পুণ্য ও ত্রাণলুব্ধ ব্যক্তিগুলির জ্ঞানজগতে বদ্ধমূল হইয়া গেল সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য সেইটাই।

একটা অত্যন্ত কৃশ চুলওঠা লোক কোঁচার খুঁট্‌টি গায়ে জড়াইয়া সন্তর্পণে দূরে দাঁড়াইয়া ছিল; —চারিদিকে চাহিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর তাহাকেই "মনোনীত" করিয়া আঙ্গুলের ইসারায় কাছে ডাকিয়া লইলেন।……সে প্লীহার ঔষধের সন্ধানে আসিয়াছিল, ভয়ে ভয়ে নিকটস্থ হইতেই সন্ন্যাসী তাহার মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া দিলেন—

প্লীহার রোগী অতিশয় আশান্বিত হইয়া অতিশয় ভক্তিভরে সন্ন্যাসীর পদধূলি লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই তাহার গায়ের কাপড় সরিয়া পেট বাহির হইয়া পড়িল; তাহার প্লীহার স্থানটিতে চিতার কষ দিয়া বীভৎস একখানা ক্ষত করা হইয়াছে; সেইদিকে চাহিয়া সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন,—আমরা তোমাদের গাঁয়ের অতিথি, আমাদের খাওয়াও।

শুনিয়া জনতা চঞ্চল হইয়া উঠিল।

—ও বড় গরীব, বাবা; কি সেবা হবে হুকুম করুন, আমরাই—

বলিয়া সকলে সসম্ভ্রমে হাত জুড়িয়া দাঁড়াইয়া রহিল।—

সাধু তখন তাঁর খাদ্যোপকরণের এমন দীর্ঘ এবং মহার্ঘ্য এক ফর্দ্দ দিলেন যে, তিনি জীবন্ত স্বর্ণমৃগের মাংস চাহিয়া বসিলেও দরিদ্র গ্রামবাসীরা ইহার বেশী বিব্রত হইয়া পড়িত না।……

ফর্দের এ-পিঠে দাঁড়াইয়া জনতা দেখিল, সন্ন্যাসী তাঁহার জটাজালসহ যেন আরও দুরতিক্রম্য হইয়া উঠিয়াছেন।—

লোকগুলির নিঃশব্দ শুষ্কমুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন,—আমি এম্‌নিই রোজ খাই। টাকা? আচ্ছা, টাকা আমিই দিচ্ছি। একজোড়া নতুন সরা আর কিছু ঘুঁটে আমায় এনে দেও তোমরা।

নূতন সরা এবং ঘুঁটে আসিল।

সন্ন্যাসী কোথা হইতে দুইটি শিশি বাহির করিয়া একটির ছিপি খুলিয়া সরার মধ্যে ঢালিলেন খানিকটা কাঁচা পারা: তারপর বলিলেন,—এটা সুলেমানী নিমক্। বলিয়া দ্বিতীয় শিশি হইতে খানিকটা "সুলেমানী নিমক্" সেই পারার মধ্যে ঢালিয়া দিতেই পারা জমিয়া কঠিন হইয়া উঠিল। সন্ন্যাসী বলিলেন, জ্বাল' ঘুঁটে।

জ্বালা হইল—

সন্ন্যাসী দ্বিতীয় সরাটি দিয়া প্রথম সরাটি আবৃত করিয়া আগুনের উপর তুলিয়া দিলেন।—

জনতা নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া সেই অদ্ভুত প্রক্রিয়া দেখিতে লাগিল।............

মিনিট পনর' পরে সরা সরাইয়া আনিয়া আবরণ তুলিয়া ফেলিতেই দেখা গেল, পারা এবং "সুলেমানী নিমক্" আগুনের উত্তাপে মিশিয়া খানিকটা সিঁদুর রঙের গুঁড়া প্রস্তুত হইয়াছে—

সন্ন্যাসী বলিলেন,—এ স্বর্ণচূর্ণ। স্যাক্‌রার দোকানে নিয়ে যাও, গলে' জমে' গেলেই খাঁটি সোনা হবে।

সত্যই সোনা।

তেরটাকা সাড়ে পাঁচ আনায় সেই সোনা বিক্রয় হইল। ......সন্ন্যাসী সশিষ্য প্রচুর ভোজন করিলেন, এবং তাঁহার "সেবার" পর সমাগত আশুভক্তগণ যাহা প্রসাদ পাইল তাহাও প্রচুর।... ..

শিবপ্রিয়র চোখে সে-রাত্রে ঘুম আসিল না।

আসিবার কথাও নয়!

অতন্দ্র চোখে আর উত্তপ্ত মস্তিষ্কে শিবপ্রিয় ভাবিতে লাগিল,—কিসের বিনিময়ে সন্ন্যাসী এই সোনা প্রস্তুত করিবার প্রণালীটা শিখাইয়া দেয়!—একখানা হাত, একখানা পা, একটি চক্ষু,—সন্ন্যাসীর কথায় শিবপ্রিয় কাটিয়া উপ্‌ড়াইয়া দিতে পারে, যদি উহাদের একটিকেই সেই বিদ্যাদানের দক্ষিণা বলিয়া সে চাহে। .. ..একটা নিদারুণ তীব্র আশা বার-বার তাহার

মনে সত্য হইয়া উঠিয়া তাহাকে যেন শরবিদ্ধ করিয়া শয্যার উপর তুলিয়া তুলিয়া বসাইতে লাগিল ·····মন্ত্র হোক্, দ্রব্যগুণ হোক্, বাক্‌সিদ্ধি হোক্,—প্রভুর অশেষ কৃপায় যেন তাহা তাহার করায়ত্ত হইয়াছে······অট্টালিকা, বৈভব কত!······নিত্য সুবর্ণমণ্ডিত সালঙ্কারা হইয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রতিমার মত হাসিতেছে।

—নিত্য ?

ঘুম ভাঙ্গিয়া নিত্য বলিল,—কি ?

—কিছু না। ভোর হতে আর কত দেরী ?

—জানিনে, দেখ। বলিয়া নিত্য আবার ঘুমাইয়া পড়িল।—

শিবপ্রিয় বুক বাঁধিল—

যেমন করিয়াই হউক, প্রভুর নিকট হইতে এ-বিদ্যা আহরণ করিতেই হইবে।······

তখনও ভাল করিয়া রাত পোহায় নাই—

শিবপ্রিয় যাইয়া দু'হাত দিয়া সন্ন্যাসীর পা জড়াইয়া ধরিল।

সন্ন্যাসী প্রশ্ন করিলেন,—কি বাবা ?

শিবপ্রিয় সন্ন্যাসীর পা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল,—বাবা, আমি বড় অনাথ, তোমার কৃপার ভিখারী।

প্রত্যুত্তরে সন্ন্যাসী বলিলেন,—কৃপার ভিখারী কে কার নয়, বাবা ? বেদান্তের সার মর্ম্মই ত এই যে, আত্মাই জগতের উপাদান, আত্মাই জগতের নিমিত্ত, আত্মাই ঈশ্বর; অতএব তুমিও ঈশ্বর, আমার প্রণম্য। আমিও তোমার কৃপার ভিখারী।

সন্ন্যাসীর এই উচ্চাঙ্গের বৈদান্তিক বিনয়ে শিবপ্রিয় শশব্যস্তে দাঁতে জিব্ কাটিয়া যেমন কুণ্ঠিত তেম্‌নি বিগলিত হইয়া গেল।

শিবপ্রিয়র সজল চক্ষুর দিকে চাহিয়া সন্ন্যাসী পুনশ্চ বলিলেন,—কিন্তু কথাটা কি ?

মুহূর্ত্তেক কণ্ঠহারা থাকিয়া শিবপ্রিয় গু গু করিয়া তাহার প্রার্থনা জানাইয়া গেল,—তুমি কি করে কাল সোনা করলে, সেইটে আমায় শিখিয়ে দাও, বাবা।

সন্ন্যাসী একটু হাসিলেন,—সেটা বিতৃষ্ণা, বিদ্রূপ, কি তৃপ্তির হাসি তাহা বোঝা গেল না; কিন্তু সন্ন্যাসী তৎক্ষণাৎ রাজি হইয়া বলিলেন,—দেব। কিন্তু একটা কথা বাবা—

—আজ্ঞে করুন। বলিয়া শিবপ্রিয় হাঁটু তুলিয়া হাত জুড়িয়া বসিল।

শিবপ্রিয় ভাবিয়াছিল, সন্ন্যাসী বুঝি কি না কি চাহিয়া বসিবেন; কিন্তু তিনি যে প্রস্তাব করিলেন তাহা যেমন স্বাভাবিক তেম্‌নি সহজসাধ্য। বলিলেন,—আমার সঙ্গে সঙ্গে তোমায় ছ'মাস থাক্‌তে হবে।—

এত সুলভ ! —

শিবপ্রিয় আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিয়া পুনর্ব্বার সন্ন্যাসীর পা জড়াইয়া ধরিল ; বলিল,—বাবা, তোমার অপার দয়া।

সন্ন্যাসী বলিলেন,—ছ'মাস যেদিন পূর্ণ হবে সেইদিন............

......ছ'মাসের প্রথম মুহূর্ত্তেই শিবপ্রিয়র অন্তরের দিক্ দিয়া পরিপূর্ণতার আর কিছু বাকি রহিল না।......

রাত্রি তখন ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে ; পৃথিবী নিঃশব্দ। ......লতাগাছ বাড়িয়া একপায়া পথের উপর ঝাঁপাইয়া আসিয়া পড়িয়াছে ; হন্ হন্ করিয়া চলিতে চলিতে তাহাতে পা বাধিয়া শিবপ্রিয় দাঁড়াইল—

কানে গেল, মাথার উপর বাঁশের ঝাড়ে বাদুড়ের ঝটাপটি, দূরে একটা পাখীর কর্কশ-কণ্ঠের আর্ত্তনাদ—কোয়াক্ কোয়াক্ কোয়াক্।............

আবার সব নীরব।—

পৃথিবীর সমস্ত আকাঙ্ক্ষা উল্লাস তৃপ্তি অতৃপ্তি ক্ষিপ্ততা সুপ্তিসমুদ্রে ডুবিয়া গেছে, কেবল শিবপ্রিয়র বুকে জ্বলিতেছে বিনিদ্র লালসা।—

শিবপ্রিয় গৃহত্যাগ করিয়াছে.........

পরিত্যক্ত গৃহে জননী নিদ্রিতা, নিত্য নিদ্রিতা—

সম্মুখে সুবর্ণের লোভ নিত্যকালের সমস্ত মোহ ছাপাইয়া দুটি ব্যগ্রবাহুর ইঙ্গিতে তাহাকে নিরুদ্দেশের দিকে প্রাণপণে ডাকিতেছে; তাহারই উগ্র উত্তাপে মায়া বুঝি বাষ্প হইয়া গেছে......

তবু শিবপ্রিয় একবার চকিতে পিছন্ ফিরিয়া চাহিয়াই চলিতে সুরু করিল।.........

আজ পূর্ণিমা ; ছ'মাস পরে আর এক পূর্ণিমায় তার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।

সন্ন্যাসী প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন—

শিবপ্রিয় "আশ্রমে" যাইয়া উপনীত হইতেই যাত্রা করিলেন।

পথের আর শেষ নাই।......

শিবপ্রিয় জিজ্ঞাসা করে,—আমরা কোথায় চলেছি, বাবা ?

বাবা গম্ভীরকণ্ঠে গন্তব্যস্থলের নামাবলী উচ্চারণ করিয়া যান,—গোকর্ণ, রামেশ্বর, মধ্যার্জ্জুন, বদরিকা, কেদার, পুণ্ডরীকপুর, কালহস্তীর—

শিবপ্রিয় চুপ করিয়া ভাবে, না জানি ইহারা কোথায়!

চিরদিন পল্লীর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ থাকিয়া শিবপ্রিয়র অন্তর ছিল শিশুর মত কুতূহলী; কিন্তু বাহিরের সমগ্র অখণ্ডতা উপলব্ধি করিয়া মনের ভাণ্ডারে চির-আনন্দের রসবিলাস সঞ্চয় করিয়া লইবার শক্তিও তার ছিল না।... .....ক্ষণেক বিস্মিত হইয়া, ক্ষণেক ম্রিয়মাণ হইয়া, ক্ষণেক অধীর হইয়া সে নীরবে সন্ন্যাসীর সঙ্গী হইয়া চলিয়াছে।—

সে কি সেবা!---

শিবপ্রিয় সাধুর পা ধুইয়া দেয়, ভাং বাঁটে, পা টিপিয়া দেয়, শয্যা রচনা করে: সন্ন্যাসীর মুখ দিয়া অকারণ এবং অবিরাম যে অশ্লীল শব্দগুলি নিঃসৃত হয় তাহা সে ভ্রূক্ষেপও করে না; কুকুর-কুণ্ডলী হইয়া সে গাছের তলায় পড়িয়া থাকে—

আর দিন গোণে—

রাবণের চিতা নাকি অনির্ব্বাণ, কান ঢাকিলেই তার আগুনের সোঁ সোঁ শব্দ কানের ভিতর বাজিতে থাকে—তেমনি করিয়া অনুক্ষণ জ্বলে সুবর্ণের পিপাসা শিবপ্রিয়র বুকে।......

ছ'মাস গেছে--

ছ'মাস পূর্ণ হইয়া আজ সেই নিরূপিত পূর্ণিমা।

বিশাল অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে সন্ন্যাসীর "ক্যাম্প" পড়িয়াছে। সম্মুখে কিছুদূরেই শীর্ণা নদী—ওপারে দিগন্তরাল হইতে চাঁদ উঠিতেছে।

দৌর্ব্বল্যের ভারে স্তিমিত নেত্রদু'টি একটু বড় করিয়া শিবপ্রিয় নিবেদন করিল,—বাবা, আজ ছ'মাস পূর্ণ হ'ল। সেবায় তোমায় তুষ্ট করিতে পেরেছি কি না জানিনে।

হাত তুলিয়া সাধু বলিলেন,—হাঁ, হাঁ, আমার খেয়াল আছে। আমি তোমার সেবায় খুব খুসী হয়েছি। আজ তোমার বরলাভ হবে।

একজন শিষ্য বলিল,—আলবৎ হোবে।

শিবপ্রিয়র তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না, সাধু মিথ্যাভাষী নহেন; তবু কথাটা নূতন করিয়া সন্ন্যাসীর মুখে শুনিয়া তার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল।—

হুকুম হইল,—সরবৎ বানাও।

সরবৎ বানান' হইল।

---নদী থেকে জল নিয়ে এস।

শিবপ্রিয় লোটা লইয়া জল আনিতে গেল।

অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছিল।

সন্ন্যাসী মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া লোটাভর্তি সরবৎ চোখের সম্মুখ হইতে নামাইয়া শিবপ্রিয়র হাতে দিলেন,—পিও।

শিবপ্রিয় ঢক্ ঢক্ করিয়া একচুমুকে একলোটা সরবৎ গলাধঃকরণ করিয়া তটস্থ হইয়া বসিয়া রহিল—

পুনরাদেশ কি হইবে কে জানে! কিন্তু আদেশ কিছু আসিল না—

সন্ন্যাসী নিমীলিত-চক্ষে ঢুলিয়া ঢুলিয়া হরগৌর্য্যষ্টক্ গাহিতে লাগিলেন,—

কস্তুরিকাচন্দনলেপনায়ৈ,
শ্মশানভস্মাঙ্গ বিলেপনায়।
সৎকুণ্ডলায়ৈ ফণিকুণ্ডলায়,
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥
মন্দারমালাপরিশোভিতায়ৈ,
কপালমালা পরিশোভিতায়।
দিব্যাম্বরায়ৈ চ দিগম্বরায়,
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥
চলৎ * * *

অষ্টকগীতির সুর সুস্পষ্ট হইয়া সুরু হইয়া ক্রমশঃ একটানা গুঞ্জনের মত শিবপ্রিয়র কানে আসিতে আসিতে মৃদু হইতে মৃদুতর হইয়া একসময় বাতাসে মিলাইয়া গেল............

শিবপ্রিয়র যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন উষাকাল, সূর্য্যোদয়ের বিলম্ব আছে।—কি উদ্দেশ্যে সে গৃহত্যাগ করিয়াছিল, কি কারণে সে এখানে, এই প্রান্তরে শুইয়া,—চোখ্ মেলিয়াই হঠাৎ তাহার কিছুই মনে পড়িল না; কিন্তু মনে যখন পড়িল তখনই এমন একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল সংসারে যাহার উপমা নাই;—অন্তরের অতলতম স্থান হইতে সহসা একটা ভূকম্পনের তীব্র তরঙ্গ উত্থিত হইয়া তার প্রাণের গভীরতম মূল পর্য্যন্ত প্রচণ্ড আলোড়নে টলাইয়া সম্মুখের দিক্‌চিহ্ন যেন কিছুক্ষণের জন্য একেবারে বিলুপ্ত করিয়া রাখিয়া দিল।......সে বিস্ময়ের সীমা নাই, সে যন্ত্রণারও সীমা নাই।......উঠিয়া বসিয়া শিবপ্রিয় ক্লান্তচক্ষে চাহিয়া রহিল; দেখিল, সশিষ্য ও সসম্পত্তি সেই সন্ন্যাসী কোথাও নাই; অর্দ্ধদগ্ধ একটা গাছের গুঁড়ি আর ভস্মের স্তূপ পড়িয়া আছে..... অসময়ের সম্বল বলিয়া যে কাঁচা টাকা দশটা সে ট্যাঁকে করিয়া আনিয়াছিল তাহাও অস্তমিত পূর্ণচন্দ্রের সঙ্গেই অন্তর্হিত হইয়াছে।

শিবপ্রিয় গা তুলিয়া ধীরে ধীরে ফিরিবার পথ ধরিল।—

দেখিলে হঠাৎ চেনা যায় না, উপবাসে অনিদ্রায় অর্দ্ধমৃত শিবপ্রিয় এম্‌নি চেহারা লইয়া ছ'মাস পরে যখন একদিন গৃহে পৌঁছিল তখন সূর্য্য ডুবু ডুবু।.........

মা বলিয়া ডাকিতেই বন্ধদুয়ার ঘরের ভিতর শুধু একটা লক্ষীপ্যাঁচা বাতাসে ভারি পাখার ঝাপ্‌টা মারিয়া স্থান পরিবর্ত্তন করিল, আর কোন সাড়া আসিল না।

—নেত্য ?

নিত্য সেখানে ছিল না।

—মা ?

ষোল সতর' বছরের একটা ছোঁড়া হারান' বাছুর খুঁজিতে সেইদিকে আসিয়াছিল; সে জঙ্গলের ভিতর হইতে বাহির হইয়া বলিল, --মা তোমার উই রায়েদের বাড়ী।

—সেখানে কি করে ?

—জানিনে। বলিয়া ছোঁড়া আবার জঙ্গলে ঢুকিল।

—মা ?

নিঃশব্দে মা আসিয়া রায়েদের পিছন্‌বাড়ীর চালার খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইল।—শিবপ্রিয় বড় আশ্চর্য্য অবাক্ হইয়া গেল—মা কথা কয় না কেন!—

—মা কথা কইছ না যে? বলিয়া শিবপ্রিয় নিত্যর সন্ধানে এদিক্ ওদিক্ চাহিতেই সেই চাহনির অর্থ বুঝিয়া সহিষ্ণুতা ভাঙ্গিয়া মা ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বসিয়া পড়িল।—

ভীত হইয়া শিবপ্রিয় বলিল,—কি হয়েছে বল না, মা ?

—কোথায় ছিলি এতদিন ? আমরা যে একেবারে ধনে-প্রাণে গেছি রে। বৌমা নেই।......

বলিয়া দক্ষ মাথা কুটিতে লাগিল। কিন্তু নিত্য নাই—এত বড় অতর্কিত আঘাতে শিবপ্রিয় যেন এক নিমেষেই আসড় পাষাণ হইয়া গেল—

খুঁটিতে পিঠ্‌ দিয়া সে ঠায় বসিয়া রহিল; না আসিল চোখে তার একফোঁটা জল, না ফুটিল মুখে একটি কথা।

—কি হয়েছিল আগে সব বল তারপর আমি জল মুখে দেব।—বলিয়া শিবপ্রিয় দীর্ঘ রুক্ষ কেশ দুইহাতে মুঠায় বাঁধিয়া পুনরায় স্তব্ধ হইয়া গেল।

দক্ষ বলিল,—অন্নকষ্ট পাইনি, বাবা, কোনোদিন। বলিয়া নতচক্ষে খানিক্ থামিয়া সে বলিতে লাগিল,—তুই যাবার সাতদিন পরে মাধব পাল একদিন হঠাৎ 'পিসি' বলে ডাক দিয়ে উঠনে এসে দাঁড়াল; বল্‌ল, শিবপ্রিয় ত' নিরুদ্দেশ, তোমাদের চল্‌বে কি করে, পিসি ? বল্‌লাম, ভগবান চালিয়ে নেবেন।......মাধব হেসে বল্‌লে,—ভগবান নিজে হাতে চালিয়ে নিচ্ছেন এমন ত' কখন দেখিনি।—তোমাদের কিছুর অভাব যদি কোনোদিন হয় তবে আমাকে জানিও, বুঝলে, পিসি ?

আমাকে তোমাদের আপনার বলেই জেন।—বলে সে চলে' গেল।...মাত্র তিনদিন সে এসেছিল; একদিন খালি বৌমাকে হেসে ডেকেছিল, বৌদি। যেচে এসে দরদ জানিয়ে যাবার কি দরকার তার পড়েছিল তা' সেই জানে আর তার ধর্ম্ম জানেন। বৌমা তাকে মুখ দেখায়নি কোনোদিন একথা আমি মা হ'য়ে তোকে বলছি, বাবা। কিন্তু গাঁয়ে রটে' গেল বড় খারাপ কথা--

—কি কথা?

—সে কথা মুখে আনতে ভয় করে: মনে হয়, সতীর শাপে মুখ খ'সে পড়বে। রটল-- মাধব পাল বৌমাকে গয়না দিয়েছে, কাপড় দিয়েছে.. ...কেউ দেখেছে হাসতে, কেউ দেখেছে পান দিতে, কেউ দেখেছে আঁচল নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে—

—তারপর?

—শুনে তার চোখের জল দিনরাত আর থামে না; ঘুরে ফিরে সে কেবলি তোর কথাই বলে, মা, সে এসে শুনে কি ভাববে, আমি এ মুখ তাকে দেখাব কেমন করে, এ মিথ্যে যে একেবারে মিথ্যে তা' আমি একা তাকে কেমন করে' বোঝাব?......বলতে বলতে সে চোখের জলে নেয়ে ওঠে।

একটু থামিয়া দক্ষ বলিতে লাগিল,—দিনরাত তার চোখ দুটো ফুলো ফুলো আর টকটকে লাল—দেখে আমার ভয় করত। না ঘুমিয়ে আর উপোসে আর ভাবনায় শুকিয়ে কাঠির মত হ'য়ে উঠতে উঠতে—

কে জানত তার মনের কথা, জানলে কি তাকে আমি একদণ্ডও চোখের আড়াল করি?......

একদিন সে—বলিয়াই দক্ষ আবার ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।......একটু থামিয়া আঁচলে চোখের জল মুছিয়া বলিতে লাগিল,—পাড়া থেকে এসে দেখি, বৌমার ঘরের দোর ভেজান, ভেতরে যেন একটা হাঁসফাঁস শব্দ হচ্ছে, ঠেলা দিয়ে দরজা খুলেই দেখি, সামনে ঝুলছে; প্রাণটা তখনও সব বেরোয়নি; দড়ি কেটে নামিয়ে নিলাম, কিন্তু—

বলিয়া দক্ষ মাথা কপাল কুটিতে লাগিল..... মিথ্যে কলঙ্ক নিয়ে সে গেছে; মিথ্যে, শিব, একেবারে মিথ্যে।—

শিবপ্রিয় সহসা ছিট্‌কাইয়া খাড়া হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল—মা, এস।

—কোথায়?

—টাউনে।

—সামনে যে রাত্তির।

—তা' হোক্। এ মাটি আর সইছে না, মা।

সেই হইতে শিবপ্রিয় ভিখারী—

মাথায় বড় বড় রুক্ষ চুল কাঁধ পর্য্যন্ত ঝুলিয়া থাকে ; চুলের লাল্‌চে রংটা রৌদ্রালোকে ঝিক্‌ঝিক্ করে ; মহিষের অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি শিংটায় ফুৎকার দিয়া সে বাজায় ; কাঠের সর্পিল লাঠিটা বগলে থাকে ; গাল ফুলাইয়া তাহার উপর আঙ্গুলের দ্রুত আঘাত দিয়া বাজায় বু—উ—উ ; মুখে বলে ববম্ বম্ ; কাপড়ের রং লাল ; গলায় রুদ্রাক্ষের মালা নাভি স্পর্শ করে ; ললাট রঙের রেখায় দ্বিভক্ত করিয়া সিন্দুরের ত্রিশূল অঙ্কিত থাকে।—

ভিক্ষা মাগিয়া পথ চলিতে চলিতে সহসা সে থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া উর্দ্ধে দৃষ্টি তুলিয়া চীৎকার করিয়া ওঠে—

চুন্ চুন্ সএ হমারে মরী ঐ। *

লোকে বোঝে না ; বলে,—পাগল।........

একটি বছর গেছে।

প্রত্যহ গভীর রাত্রে আসিয়া নিত্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্ষমা চাহিয়া যায়—

শিবপ্রিয় শয্যায় পড়িয়া কান পাতিয়া থাকে ; আকাশে কোথায় নিত্যর কণ্ঠ ধ্বনিত হয় ; তারই চোখের জল ফোঁটায় ফোঁটায় পড়িয়া বুঝি শিয়রের মাটি ভিজিয়া থাকে।......

দক্ষ একদিন অসুখে পড়িল ; কিন্তু বেশী ক্লেশ সে দিল না ; তিন দিনের দিনই বোঝা নামাইয়া দিল।

আবৃত শবদেহ স্পর্শ করিয়া শিবপ্রিয় হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া বসিয়া ছিল ; মন তার আশ্রয়চ্যুত হইয়া হা হা করিয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছিল।—নিত্যর অপমৃত্যুর স্মৃতি ত ভুলিবার নয় ; নিত্যর সেই নিদারুণ সতীধর্ম্মপালনের, সে যে আপন হাতে বৃন্ত ছিন্ন করিয়া গেছে সেই নিষ্ঠুরতম কথাটার সাক্ষী কেবল মা, আর তার নিজের অন্তরাত্মা।......এই দুঃসহ উপলব্ধিটাই তার মনে জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল, মা মরিয়া আজ সে একেবারে একা—

নিত্যর বিরুদ্ধে সমস্ত জগত—

মা তাহাকে একান্ত নিঃসহায় নিঃসঙ্গ করিয়া সংসারের উত্তপ্ত এক প্রান্তে দাঁড় করাইয়া দিয়া গেছে—

নিত্যর পক্ষে সমস্ত জগতের বিরুদ্ধে আজ সে একা—

সান্ত্বনা চাহিয়া মুখপানে চাহিবে এমন আর কেহ নাই।......

মনে পড়িতে লাগিল, মা তাহাকে কি করিয়া মানুষ করিয়া তুলিয়াছিল !—

---

* বাছিয়া বাছিয়া আমার শত্রু নিপাত কর।

265

শিবপ্রিয় বলিত,—আমি ছেলেবেলায় খুব কাঁদ্‌তাম, নয়, মা ?

মা বলিত,—কম জ্বালিয়েছ তুমি আমাকে ; এক একদিন—

—খুব গরীব ছিলাম নাকি আমরা ?

মা কথা কহিত না।—দুগ্ধপোষ্য শিশুটিকে বুকে লইয়া সদ্যঃবিধবার সেই ভিক্ষা-জীবনের দিনগুলি মনশ্চক্ষুর সম্মুখে দ্রুতবেগে উদ্ঘাটিত হইতে থাকিত। ...

শিবপ্রিয় বলিত,—তুমি নিজে না খেয়ে ভিক্ষে করে আমাকে খাইয়েছ, একথা সত্যি, মা ?

মা হাসিয়া বলিত,—কে বললে তোকে ?

—লোকেই বলে। বলিয়া হঠাৎ সরিয়া আসিয়া শিবপ্রিয় মায়ের পায়ের ধূলা দু'হাতে করিয়া মাথায় লইত।......

ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ তার মনে হইল, মা বুঝি সাম্‌নেই বসিয়া আছে—

তাড়াতাড়ি চোখ তুলিতেই বস্ত্রাবৃত শবদেহ পার হইয়া তার দৃষ্টি যাহার উপর পড়িল সেটা একখানা অপরিচিত মুখ।—

জানালার জালিতে মুখ দিয়া কে একজন দাঁড়াইয়া ছিল ; শিবপ্রিয়কে মুখ তুলিতে দেখিয়া সে সকৌতুকে প্রশ্ন করিল ,—ওরে পাগলা, তোর মা মরেছে ? ফেল্‌বি না রেখে দিবি ?

শিবপ্রিয় বলিল,—লোক চাই যে, বাবা, ডেকে দাও না। আমরা—

—তা' দিচ্ছি, কিন্তু মাল চাইবে তারা। আছে ত ?

—নেই ত।

—গঙ্গারাম।—বলিয়া সে চলিয়া গেল, এবং অল্পক্ষণ পরেই আরও চারজনকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া উঁকি মারিয়া কহিল,—পাগলা, আছিস্ ত ?

—আছি বাবা।

—নে, তবে ওঠ্। মাল আন্‌গে ; আমরা মড়া আগ্‌লাচ্ছি। বলিতে বলিতে এক এক করিয়া পাঁচজন শ্মশান-বন্ধু ঘরে ঢুকিল।

যে বন্ধুটি মৃতদেহ আবিষ্কার করিয়াছিল সে বলিল,—পাঁইটে হবে না তা বলে দিচ্ছি ; বোতল চাই দুটো। কি বল, হরিদাস ? ঠ্যালা ত' কম নয় !—

হরিদাসও ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, বোতল দুটোই চাই, এবং ঠ্যালাও কম নয়।......

শিবপ্রিয় বাক্স হাতড়াইয়া কি পাইল তাহা সেই জানে ; কিন্তু তক্তপোষের নীচে হইতে যে বস্তুগুলি লইয়া সে বাহির হইয়া গেল তাহা কাঁসা আর পিতল।—

আজ শ্রাদ্ধের দিন।—

শিবপ্রিয়র কোনোই যোগাড় নাই ; সে এক মতলব ঠাওরাইয়াছে।—

দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত শুইয়া কাটাইয়া সে উঠিল………

মায়ের কুশাসন হইতে একটি কুশ বাহির করিয়া লইয়া একবস্ত্রে যখন সে ঘাটে আসিল তখন নদীতীরে স্নানার্থী কেহ নাই।—

ঘাটের উপর সমতলস্থানে শিবমন্দির।—

জলের ধারেই খানিকটা স্থান গঙ্গাজল দিয়া সযত্নে সমতল পরিষ্কার করিয়া লইয়া শিবপ্রিয় সেই কুশ তিনখণ্ডে বিভক্ত করিয়া পাতিল……বালির একটি পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া লইয়া অঞ্জলির মধ্যে ধারণ করিয়া মনে মনে উচ্চারণ করিল,—দশরথ রামের হাত থেকে বালির পিণ্ড নিয়েছিলেন ; মা, তুমিও আমার এই বালির পিণ্ড নাও।……বলিয়া বালির পিণ্ডটা ত্রিখণ্ডিত কুশের উপর স্থাপন করিয়া সে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিল।……

কতক্ষণ সে ধ্যানস্থ হইয়া ছিল কে জানে, কি ধ্যান করিল সেই জানে ; কিন্তু চোখ খুলিয়াই হঠাৎ সে ছ্যাঁৎ করিয়া চমকিয়া একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইল।… বালির পিণ্ড অন্তর্হিত হইয়াছে …..চারিটি অঙ্গুলির দাগ সম্মুখের সেই কুশক্ষেত্রে একেবারে স্পষ্ট।…নির্নিমেষ চক্ষে সেই রেখাকটির দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে শ্রাদ্ধের এই অচিন্ত্যনীয় সার্থকতায় শিবপ্রিয়র সর্ব্বান্তঃকরণ কাঁপিয়া কাঁপিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দে বিস্ময়ে কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া গেল।—

……প্রেতলোকবাসিনী জননী স্বহস্তে পিণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন !—

এ আনন্দ যে কতবড় আনন্দ, কাহারও অদৃষ্টে যদি এমনধারা ঘটিয়া থাকে তবে সেই তা' জানে। আনন্দে পরিতৃপ্তিতে কূলে কূলে পূর্ণ হইয়া শিবপ্রিয় ঘাড় গুঁজিয়া চলিতেছিল ; শিবমন্দিরের কাছে আসিতেই কে যেন ডাকিল,—এই বাঙ্গালী ?

শিবপ্রিয় দাঁড়াইয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, কৌপীনপরা দুইটা খোট্টা ছোঁড়া মন্দিরের ছায়ায় দাঁড়াইয়া দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে।……

তাদের একজন বলিল,—এই দেখ্।…বলিয়া সে হাত বাড়াইয়া যাহা দেখাইল তাহাতে শিবপ্রিয়র মুহূর্ত্তপূর্ব্বের সীমাহীন থৈ থৈ অগাধ আনন্দ বজ্রাগ্নিশিখায় পুড়িয়া নিঃশেষে শুকাইয়া তার বুকের ভিতরটা ভাঙ্গিয়া চূরিয়া সেখানে যে কি বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল তাহা একমাত্র তিনিই জানিলেন যাঁহার অগোচর কিছুই নাই।……

শিবপ্রিয় দুই হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল,—চুন্ চুন্ সএ হমারে মরী ঐ।

……বলিয়া অকস্মাৎ যখন সে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল তখন তাহারা বালির পিণ্ড মাটিতে নিক্ষেপ করিয়া নক্ষত্রবেগে ছুটিতেছে।……

কিছুক্ষণ দৌড়াইয়াই শিবপ্রিয় ভুলিয়া গেল কেন সে দৌড়াইতেছে।…দাঁড়াইয়া পড়িয়া সে

চারিদিকে একবার চাহিল ; একটি লোক ছাতি মাথায় দিয়া যাইতেছিল ; শিবপ্রিয় তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—নদীটা কোন্‌দিকে বলে' দিতে পারেন ? নাইব।

—ওদিকে, ওই গলি দিয়ে গেলেই সাম্‌নেই।

শিবপ্রিয় বলিল,—ধোঁকা দিচ্ছ, বাবা ? ওদিকে আর নেই, সরে গেছে।

– জানা আছে দেখ্‌ছি, তবে জিজ্ঞেসা করে কি তামাসা করা হচ্ছিল ?—বলিয়া ছাতি মাথায় লোকটি শিবপ্রিয়র উন্মাদদৃষ্টির দিকে চাহিয়া একটু ত্বরিতপদেই অগ্রসর হইয়া গেল। . .

সেই দিন হইতে পথে পথে অহোরাত্র কে চীৎকার করে—

চুন্ চুন্ সএ হমারে মরী ঐ !

শব্দটা আর্ত্তনাদের মত শোনায়।

লোকে বলে—সেই পাগলাটা।

এইবার লোকে ঠিক বলে।

অন্নদার অভিশাপে—

গভীর রাত্রে নিদ্রিতা স্ত্রীর মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে সহসা গুরুর দুই চক্ষুর কোণ বহিয়া জলের ধারা নামিয়া আসিল। কিছু পূর্ব্বেই স্ত্রীর অতি সত্য অথচ অতি কঠিন বাক্যগুলি তাহাকে নিরতিশয় বিদ্ধ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে ; কিন্তু তখন চোখে জল আসে নাই, চোখ দুটা শুধু জ্বালা করিয়াছিল, বুকের ভিতরটা মুচ্‌ড়াইয়া টাটাইয়া উঠিয়াছিল। সত্যকে তখন মিথ্যা বলিয়া ভ্রম হয় নাই ; কিন্তু সে সত্য ক্ষমাহীন নিষ্ঠুরহস্তে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়াছে তাহার বেদনায় সংজ্ঞাশূন্য মনের উপর। এতক্ষণ পরে তাহার মনের সংজ্ঞা ফিরিয়াছে, এবং সংজ্ঞা ফিরিতেই চোখের জল আর বাধা মানে নাই।—

গুরুর মনের অবিকল সত্যকার রূপটা—এতদিনে একটি মুহূর্ত্তের জন্যও অমলার চক্ষে ধরা পড়ে নাই। আজ গুরুর মনুষ্যত্বের প্রতি সংসারের ধিক্কারের সীমা নাই—সংসারের দেওয়া লজ্জা, অপমান আর মনোবেদনার ভারে গুরু ধূলির সঙ্গে মিশিয়া গেছে, তবু তার মুখের হাসিটি আজিও তেমনি সজীব তেমনি অম্লান। কিন্তু তাহার ঐ নিরবচ্ছিন্ন হাসির অন্তরালে হৃদয়ের একটা গভীর রক্তাক্ত ক্ষত দিবারাত্র লুকানো থাকিতে পারে, চোখের আড়ালের এই নিগূঢ় তথ্যটি অমলার মনে কখনো সন্দেহের সঙ্গেও দেখা দেয় নাই। তাই সে কথাবার্ত্তার মাঝখানেই সেই অজ্ঞতাবশতঃ হঠাৎ অসহিষ্ণু হইয়া কথার মাত্রা রক্ষা করিতে পারে না।

আজ অমলা একেবারেই বলিল,—আমায় সকলের পায়ের তলায় এনে ফেলে দিলে? বলিয়া গুরুর দিকে সে চাহিয়া রহিল, বহুক্ষণ তার চোখে পলক পড়িল না।

এ অনুযোগে কিছুমাত্র অত্যুক্তি ছিল না, এবং কথাটা যে আমূল যথার্থ তাহা গুরু নিজে যেমন জানে তেমন করিয়া আর কাহারো জানা নাই। যে পুরুষ নিজে অপরের পদতলে, অপরের পদতল ছাড়া আর কোন্ স্বর্গে তার স্ত্রীর আশ্রয়? পৃথিবী দিগন্ত পর্য্যন্ত বৈশাখের বৃষ্টিহীন মধ্যাহ্ন আকাশের মত ক্ষুধার উত্তাপে ধক্ ধক্ করিতেছে—পথভ্রষ্ট নিরুপায়ের শ্রান্তি তাই অপরের পদচ্ছায়ায়। ক্ষুন্নিবৃত্তির উপকরণ মুখে তুলিতে চোখের জলে দৃষ্টি বুজিয়া আসে, তবু গুরু হাসে। অস্থানের অযোগ্য সেই হাসিটার মূল্য যে কত তাহা ধারণা করিতে না পারিয়া অমলা কাঁদিয়া কাটিয়া অকর্ম্মণ্য উপায়হীনের অশেষ মর্ম্মদাহের উপর আগুন জ্বালিয়া দেয়।

স্বামীর প্রতি সংসারের অশ্রদ্ধায় স্ত্রীর বেদনার পরিমাণ কত তাহাও গুরুর কাছে অপ্রকাশ নাই। ইহাও সে জানে, যেখানে চলাই নিয়ম সেখানে অচল হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলে স্রোতের

আঘাত লাগিবেই; এবং সচল অবস্থায় যে ক্লেশ অনুভূত হয় না, চলিতে অক্ষম হইয়া উঠিলেই নিত্যসঙ্গিনীকে বহনের সেই ক্লেশ দেখিতে দেখিতে দুঃসহ হইয়া ওঠে। দর্পণের বুকে প্রতিবিম্বের মত গুরু অমলার অন্তরটা স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছে।—নিজেরই অস্তিত্বের প্রতি এই অসাধারণ ধীমতী নারীটির আর কিছুমাত্র শ্রদ্ধা নাই; ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় পূর্ণ হইয়া একদিকে যেমন তার সুকঠিন ক্রোধের অন্ত নাই, অন্যদিকে স্বামীর প্রতি নিদারুণ একটা প্রীতি আলোড়িত হইয়া তাহাকে মুহূর্ত্তের জন্যও শান্তি দিতেছে না। অমলার মনের এই হিংস্র ক্ষিপ্তত আর যাহাই হোক অস্বাভাবিক নহে।

সংসার যাহার কাছে তাহার প্রাপ্য আদায় করিতে পারে না তাহাকে সে তাহার অভ্যন্তরের আশ্রয়-কোষ হইতে বিচ্যুত করিয়া ঠেলিয়া ঠেলিয়া ভাসাইয়া তুলিয়া নির্ব্বাসিত করিয়া দিতে চায়, এই নির্ম্মম অনিবার্য্য সত্যটিও গুরুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই ভাসাইয়া দিবার কাজটি এমনই দৃঢ় দানবীয় বিরামহীন কঠোরতার সহিত চলিতে থাকে যে, নিষ্কৃতির রন্ধ্র কোথাও থাকে না;—এই নিষ্পীড়ন পুরুষের পক্ষে যেমন জীবন্ত, স্ত্রীর পক্ষেও ঠিক তেম্‌নি; অগোচরে থাকিবার বস্তু সে নয়। এই দেনাপাওনার জগতে শুধু পাওনার দিক্‌টাই ভারি করিয়া তোলা যায় না—এবং সেই অসাধ্য অসম্ভব কার্য্যটি করিতে উদ্যত হইলেই দিগ্বিদিক হইতে প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিত যে আঘাত পর পর ছুটিয়া আসিতে থাকে তাহা যতই প্রাণান্তকর প্রচণ্ড হোক্, তাহাকে অস্বীকার করিয়া পরিহার করিবার উপায় বুঝি দেবতারও জানা নাই।

গুরুর দেড় বৎসরব্যাপী নিষ্কর্ম্ম জীবনের এই সবল অভিজ্ঞতাটি সম্পূর্ণ নূতন এবং তেজস্বী, প্রাণবান্। সে যখন চাক্‌রী ছাড়ে তখন কেবল এই কথাটাই তাহার কাছে সর্ব্বাপেক্ষা বড় হইয়া উঠিয়াছিল যে, চাক্‌রী শুধু অন্ন আনয়নের দ্বার নহে, তাহা নিরবসান শান্তির একটা নিজস্ব অটুট নিকেতনে প্রবেশের দ্বারও বটে।…ভৃত্যজীবনে এই কথাটা কখন সত্য কখন মিথ্যা—এম্‌নি ধারা সত্যমিথ্যায় জড়ানো বলিয়াই গুরুর উত্তেজনায় অশান্ত মন মিথ্যার দিক্‌টা দেখিতেই পায় নাই। তার উপর আশা ছিল, জীব দিয়াছেন যিনি, আহার দিবেন তিনি, অর্থাৎ উপায় হইবেই; কিন্তু চাক্‌রীর দিকে পিছন্ ফিরিয়া সম্মুখে যে সুপ্রশস্ত আলোকিত ক্ষেত্র সে বিস্তৃত দেখিয়াছিল তাহা দিন দিন সঙ্কীর্ণতর হইতে হইতে একেবারে চিহ্নহীন শূন্যে রূপান্তরিত হইয়া তাহাকে পরের দুয়ারের কাঁটাবনের উপর বসাইয়া দিয়া গেল।—

যে সম্ভ্রম বাঁচাইতে গুরু চাকরী ছাড়িয়াছিল, পরের দুয়ারে আসিবার সম্ভাবনাতেই যে সেই সম্ভ্রমই পুনরায় বিপন্ন হইতে পারে, পরের দুয়ারে বসিবার আগে সে কথাটা তার মনেই পড়ে নাই। মনে পড়িলেই যে উপায় কিছু হইত সে নয়, কিন্তু গুরুর ঐ মনে না পড়াটাই অমলার চোখের সাম্‌নে নির্ব্বোধের অমার্জ্জনীয় অপরাধের আকার ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

গুরুর নিজের কাছে সেটা অপরাধ নয়—ভুল। একই জিনিষকে দুইজনে দুই চক্ষে দেখিয়া একজন একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল, আর একজনের সশব্দ সাশ্রু অধীরতার অন্ত রহিল না।

গুরু স্ত্রীকে ভালবাসিত। আত্মসম্মানের ক্ষয়ে সে নিজের জন্য নিজে যেমন ব্যথিত, ততোধিক ব্যথিত সে অমলার দিকে চাহিয়া। কিন্তু যার জন্য এত ব্যথা তাহার কাছে ত ব্যথার কথাটা মুখ ফুটিয়া বলা যায় না। দেবতার সম্মুখে বসিয়া শপথ করিয়া সে স্ত্রীর অন্নবস্ত্রের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল—সেই দেবতা তাহার কাছে যেমন প্রত্যক্ষ সত্য, দায়িত্বও তেমনি আমরণ অটল; পলায়ন করিয়া তাহাকে পশ্চাতে ফেলিবার উপায় নাই, অন্ধ সাজিয়া তাহাকে না দেখাও চলে না; অথচ চতুর্দ্দিকের পৃথিবী সকল দুয়ার বন্ধ করিয়া দিয়া মুখ আঁটিয়া বসিয়াছে, অন্ন আহরণে যাইবার পথ কোনোদিকেই খোলা নাই। গুরুর মানসিক যন্ত্রণার শেষ নাই, তুলনা নাই।

বোঁটা শুকাইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষ-মাতার সঙ্গে যেমন ফলটির সম্পর্ক ফুরাইয়া আসে, তেমনি একটা ভাবান্তর গুরুর বুকে চলিতেছিল। অন্নের গ্রাস নিয়মিতভাবেই উদরে পৌঁছিতেছে—কিন্তু মানুষ তাজা থাকে শুধু অন্নরস পরিপাক করিয়া নয়, তাহার মনের সজীব থাকার পক্ষে আরও কিছুর প্রয়োজন; সেই সার বস্তুটির অভাবেই গুরুর সংসারের সঙ্গে যোগের বৃন্তটি দুর্ব্বল হইয়া যেন তাহাকে আর ধরিয়া রাখিতে চাহিতেছে না।

ভিতরের এত খবর অমলা রাখে না। সে মাঝে মাঝে বলে,—দুবেলা ত খাচ্ছো বেশ; আমি আশ্চর্য্য হই এই ভেবে যে, ভাতের গ্রাস তোমার মুখে ওঠে কেমন করে!

গুরু হাসিয়া বলে,—সে কৌশলটি জানে না এমন মানুষও ত আমি দেখি নে।

অমলা আগুন হইয়া বলে,—আমায় বলা হচ্ছে? আমি ভাত খাই নে, যা' খাই তা' আমিই জানি। আমি পুরুষ হ'লে তোমাকেও খাওয়াতাম, আমিও খেতাম।

গুরুর প্রাণে স্ত্রীর প্রতি যে একটা অসীম ধৈর্য্যশীল সদয় মার্জ্জনার ভাব নিরন্তর জাগরূক থাকিত, সেটা অমলার অঙ্কুশের এই আঘাতেও ক্ষুণ্ণ হইত না। তাহার চাইতে কে বেশী জানে যে, অমলাকে সে যে অবস্থায় রাখিয়াছে তাহাতে তাহার মুখ দিয়া ঐ কথা বাহির হওয়ার মত স্বাভাবিক আর কিছুই নাই।

অনুগ্রহের অন্ন গিলিতে গুরুর কণ্ঠনালীর মুখ আঁটিয়া আসে, তবু এই ক্লেশমোচনের তেমন প্রাণপণ উদ্যোগ তাহার কই? গুরু নিজের কাছেও স্বীকার করে, প্রশ্নটি অবোধ প্রশ্ন নহে। কিন্তু—

তাহার হাত আছে পা আছে, আর সে অবয়বগুলি দিব্য সুস্থ, সাধারণের চাইতে কিছুমাত্র দুর্ব্বল নহে; অল্পতর বুদ্ধি বিবেচনার লোক বলিয়া যাদের অপবাদ আছে তারাও পরান্ন গলাধঃকরণ করিয়া বাঁচিয়া নাই; তবে কেন এই কষ্ট পাওয়া আর দেওয়া?

অমলার এ প্রশ্নের উত্তর আর সে কে দিবে! উত্তরটি দেশের কত লোক যে খুঁজিয়া খুঁজিয়া গলদঘর্ম্ম হইতেছে তাহারই যে ইয়ত্তা নাই।

---চাক্‌রী করেই ত' দেশের লোক খাচ্ছে। কেবল তোমার বেলাতেই স্থান নেই?

চাক্‌রী করিয়াই দেশের অসংখ্য লোক খাইতেছে ইহা গুরু অস্বীকার করে না: আবার অসংখ্য লোকই যে খাইতে পাইতেছে না তাহা লইয়াও সে তর্ক করিতে চায় না; শুধু হাসিয়া বলে,---অদৃষ্ট!

কিন্তু সকলেই জানে, এবং অমলাও জানে যে, এম্‌নি করিয়া হা'ল ছাড়িয়া দিয়া অদৃষ্টকে নির্ব্বিবাদে মানিয়া লওয়ার মধ্যে অলস পরাঙ্মুখ মনের অনায়াস একটা আত্ম-মার্জ্জনার চেষ্টা থাকে। তাই অমলা বলে, --কথাটা আহাম্মক আর আল্‌সের।

—কিন্তু তুমি ত জানো, একটি বছর ধরে' দোরে দোরে কত ঘুরেছি, কোনো কোনো দিন অনাহারে—

—তাই সব দোর ছেড়ে এই দোর ধরে আছ সস্তা ভাতের আশায়?

এম্‌নি বচসা শতবার উঠিয়া এম্‌নিভাবেই শেষ হইত! হোক্ সে স্ত্রী, তবু সে একদিক দিয়া বাহিরেরই মানুষ। বাহিরের মানুষ অপরের মনের প্রাণান্তকর আকুলিব্যাকুলির কোনো খবরই রাখে না, প্রাণপণ চেষ্টার ইতিহাস সে জানিতে চায় না—সে শুধু সফলতা নিষ্ফলতার স্তুতি-নিন্দায় মুখর হইয়া উঠিতে জানে।

আজ রাত্রে গুরু শুইতে আসিয়া অমলার রূপান্তর দেখিয়া বিস্মিত হইল। এতদিন সে স্ত্রীর রুক্ষ অসহিষ্ণুতাই দেখিয়া আসিয়াছে, কিন্তু আজ দেখিল তার চোখের জল। ঘরে দীপ জ্বলিতেছিল—গুরু দেখিল, দীপের ধারে মাটিতে বসিয়া অমলা একদৃষ্টে সম্মুখের দিকে চাহিয়া আছে, আর চোখের জল টপ্ টপ্ করিয়া তার কোলের উপর ঝরিয়া পড়িতেছে। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে অসীম উৎকণ্ঠা লইয়া গুরু অমলার পাশে নিঃশব্দে বসিয়া পড়িল। চোখের জল আঁচল দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া অমলা তাহার দিকে ফিরিয়া বসিল; তাহার হাতখানা হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া ব্যাকুলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—সত্যি করে' আজ আমায় তুমি বলো, আমায় ভালবাস?

এতদিন পরে অমলার মুখে এ প্রশ্নটা বড় আশ্চর্য্য শুনাইল, কিন্তু পরক্ষণেই একটা

নিদারুণ সংশয় জন্মিয়া গুরু শঙ্কিত হইয়া উঠিল; গুরুর অনুরাগ অর্পণের ক্ষেত্র এই পৃথিবী এবং অমলা, কিন্তু অমলা সর্ব্বহৃদয় দিয়া একান্তভাবে আশ্রয় করিয়া আছে একমাত্র তাহাকেই। অমলা তাহার নিজস্ব সত্বাটি বিসর্জ্জন দিয়া একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে স্বামীর সত্বায়—অন্ততঃ এতদিন ত তেমনটিই ছিল। কিন্তু আজ বুঝি তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। হইতে পারে, যন্ত্রণা সহিয়া সহিয়া অশেষ নির্য্যাতনে উন্মত্ত হইয়া সে নিজেরই অবোধ ভালবাসার সন্ধান আজ হারাইয়া ফেলিয়াছে—তাই এই প্রশ্ন। অমলার সকল অনিষ্টের মূল যে গুরু নিজে।

গুরুর বুকের ভিতরটা হঠাৎ শুকাইয়া উঠিয়া কাঠ হইয়া গেল।

প্রশ্নের উত্তরের আশা বোধ হয় অমলা করেই নাই। একটু থামিয়া সে বলিতে লাগিল,—আমায় এত দুঃখ কেন তুমি দিচ্ছ? তোমার দুঃখ আমি বুঝি; কিন্তু আমার দুঃখ কেন তুমি বোঝ না, আমায় আজ তা' বলতেই হবে।

অমলার এ অভিযোগেরও প্রত্যুত্তর আসিল না; অমলাও থামিল না; বলিতে লাগিল,—আমার মুখ তুলে' কথা কইবার মুখ তুমি রাখনি। আমি আর সইতে পারি নে, আমায় এখান থেকে নিয়ে চলো।

—কোথায় যাব?

—তা আমি জানি নে। যাবার স্থান না থাকে বিষ এনে দাও। বলিয়া অমলা গুরুর বুকের উপর লুটাইয়া পড়িল।

আজ দুপুর বেলাতে বড় গুরুতর একটা ঘটনা ঘটিয়া গেছে।...অবাধ্য ভৃত্যকে অমলা ভৎসনা করিতে উদ্যত হইতেই অপর একটি নারীকণ্ঠ বলিয়াছিল,—চাকরকে তুমি কিছু বল' না, অমলা। চাকর একটা রাখতে পার? না, চলে গেলে এনে দেবে? মাইনে দিচ্ছি আমরা, শাসন-কর্ত্রী তুমি সাজলে চলবে না ত'। আমাদের চাকর, যা' বলবার হয় আমরা বলব—ইত্যাদি।

শুনিয়া চাকর বেটা হাসিয়াছিল, কিন্তু অমলার তখন মনে হইয়াছিল, ঐ কণ্ঠ দিয়া যে বিষ এইমাত্র উদ্গিরিত হইল তাহাতে বুঝি ব্রহ্মাণ্ড পুড়াইয়া দেওয়া যায়।

এতদিন এমনি সব কথায় অমলার স্বামীকে মনে পড়িত—আজ তাহার মৃত্যুকে মনে পড়িয়াছে। মৃত্যু ইহার চাইতে ঢের ঢের ভাল!—

স্বামীকে নিজে সে যতই আহত করুক, বাহিরের আঘাত হইতে তাহাকে জীবন দিয়াও বাঁচাইতে হইবে, এত দুঃখের মধ্যেও মমতার সে-কথাটি অমলা মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হয় নাই।

আজ অমলা ব্যথায় বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে; প্রাণের প্রতি সত্যসত্যই আজ তার বিন্দুমাত্র

মমতা নাই, তবু স্বামীকে সে ঐ অপমানের ভাগী করিতে পারিল না। কিন্তু গুরু দেখিল, এই বন্ধ্যা নারীটির অপার অস্থিরতার মধ্যেও যে একটুখানি সহনশীল দৃঢ়তা ছিল তাহা যেন আজ অতল-স্পর্শ আশ্রয়হীন অন্ধকারের গর্ভে তলাইয়া গেছে।......

অমলা কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। অমলার মুখের দিকে চাহিয়া যন্ত্রণায় গুরুর সর্ব্বশরীর মাতালের মত টলিতে লাগিল।

পরিত্রাণের উপায় চিন্তা করিতে করিতে, যে ইচ্ছাটা গুরুর মনে সময় সময় হেলায় ফেলায় উদয় হইত, সেইটাই এখন এক নিমেষে একেবারে সুদৃঢ় সঙ্কল্পে পরিণত হইয়া তার বিচারবুদ্ধি নিঃশেষে বিলুপ্ত করিয়া দিল।......

অমলার গায়ের উপর হাত রাখিয়া গুরু ডাকিল,—ওঠো।

তিন ডাকের পর অমলা উঠিয়া বসিল।

গুরু বলিল,—চলো, আমরা যাই।

—কোথায় ?

—কলকাতায়।

—সেখানে গেলে উপায় হবে ?

—হবে।

দুইজনে দুইখানামাত্র বস্ত্র এবং পাথেয় লইয়া নিঃশব্দে দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

* * * *

গুরুর নাম এখন এড্‌ওয়ার্ড রায়; মিশনারী স্কুলের সে শিক্ষক; বেতন পঁয়তাল্লিশ টাকা

পুরাতন ভৃত্য—

বিশ্বেশ্বর যাজকব্রাহ্মণ—তাঁর যত যজমান সবই নমঃশূদ্র। তাঁহার শিষ্যরা শুদ্ধমাত্র আন্তরিক ভক্তি-শ্রদ্ধা দিয়াই ঠাকুরকে তৃপ্ত রাখে না, অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া ভক্তির সঙ্গে আরো যাহা দেয়, ভক্তির চাইতে সংসারে তার ঢের বেশী আদর এবং প্রয়োজন।

ঠাকুরের মারফত শিষ্যরা পারত্রিক মুক্তির সন্ধান পাইয়াছে কিনা কেবল তাঁহারাই জানেন যাঁহারা অন্তরীক্ষে থাকিয়াও মানুষের অন্তরের কথা বুঝিতে পারেন। বিশ্বেশ্বরের নিজেরও যদি সে খবরটা জানা না-ও থাকে, তবু সে-অজ্ঞতা পুরোহিত ও যজমানের মধ্যে দেনা-পাওনার আসল কাজে ব্যাঘাত ঘটাইতে আজ পর্য্যন্ত পারে নাই। বিশ্বেশ্বর যাহা দান করিতেন তাহার সারবত্তা ও সার্থকতায় সংশয় থাকিলেও বুঝি থাকিতে পারে, কিন্তু যাহা গ্রহণ করিতেন, সংশয়ের ঘুণ প্রবেশের মত দৌর্ব্বল্য তাহার অঙ্গে থাকিতে পারে না।—

বিশ্বেশ্বরের প্রাপ্তি প্রচুর হইলেও, বাহিরটা দেখিয়া মনে হয়, যেন সঞ্চয় প্রচুর হয় নাই। যাজকব্রাহ্মণ চির-দরিদ্র, এ-টা প্রমাণনিরপেক্ষ সত্য—কারণ দরিদ্র ব্রাহ্মণকে দানে তুষ্ট কর, চাহিদার মূলমন্ত্রই ঐ। লোকে দেখিত, যুগধর্ম্মের দোহাই দিয়া ছোট্ট দু-আনিটি পর্য্যন্ত তার জ্যেষ্ঠদের অনুসরণ করিয়া, বিশ্বেশ্বরকে একেবারে দেউলিয়ার হাটে বসাইয়া দিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া যায়,—বিশ্বেশ্বর প্রাণপণ করিয়াও ঐ চঞ্চল বস্তুগুলিকে আটকাইতে পারেন না; তাই তাঁর এত আকুলি ব্যাকুলি আর বাজার-দেনা।

কাজেই যখন স্ত্রী ক্ষেমঙ্করী স্বর্গারোহণ করিলেন তখন বিশ্বেশ্বরকে ভিক্ষায় বাহির হইতে হইল।—

নামাবলী, টিকি এবং পৈতা, এরা বাহ্যিক একটা নির্জ্জীব সরঞ্জামমাত্র, ব্রাহ্মণীর শ্রাদ্ধের খরচ তোলা একা তাহাদের সাধ্য নয়; বিশ্বেশ্বর তাই জিহ্বাগ্রে সাজাইতে সাজাইতে চলিলেন শব্দব্রহ্মকে—যাহা উচ্ছন্নে পাঠাইতে পারে, রাজা করিতে পারে, এমন-কি অপুত্রককে পুত্র দিতে পারে; মন ভিজাইয়া টাকা আদায় করিতে ত' পারেই।...মজুত তহবিল হইতেই বিশ্বেশ্বর শ্রাদ্ধের খরচটা অক্লেশেই দিতে পারিতেন; কিন্তু এটা যে বড় জানা কথা যে, শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ভিক্ষায় ব্রাহ্মণের লজ্জার কারণ তেমন নাই, আর তাহা বিশেষ ফলপ্রদ। শূদ্রের পুণ্যলাভের লোভ অক্ষয় রহুক, তাহা হইলেই শ্রাদ্ধের খরচের জন্য পুরোহিতের আর ভাব্না থাকিবে না।—

বিশ্বেশ্বরের সঙ্গে চলিল ভৃত্য নব।

নবর বয়স এখন সাতা'শ। যখন প্রথম সে বিশ্বেশ্বরের চোখে পড়ে তখন তার বয়স ছিল বাইশ। এই পাঁচ বৎসরেই সে বিশ্বেশ্বরের সংসারের অপরিহার্য্য পুরাতন একটা অঙ্গের সামিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।…নব যখন আসে নাই তখন তাঁদের কাজকর্ম্ম কেমন করিয়া নির্ব্বাহ হইত, এই কথাটা ভাবিয়া মাঝে মাঝে বিশ্বেশ্বরের সহর্ষ বিস্ময়ের অবধি থাকে না; এখন ত সে না হইলে এক মুহূর্ত্তও চলে না!

পাঁচ বৎসর আগে ফাল্গুনমাসের একটা দিনে রুদ্রপুরের শ্রীধর মণ্ডলের বাড়ীর বাস্তুপূজা সারিয়া বিশ্বেশ্বর আ'ল ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাঠ পাড়ি দিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন; মাঠের শেষে গ্রামে উঠিবার পথের প্রান্তে কড়ুই গাছটার নীচে পৌঁছিয়াই তিনি বাধা পাইলেন; দেখিলেন, একটি লোক হাত-পা ছুটাইয়া কাত হইয়া পড়িয়া ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ছাড়িতেছে। তার দরিদ্রবেশের দিকে চাহিয়া বিশ্বেশ্বর ডাকিলেন,—কে তুমি এমন করে' পড়ে' ?

যে পড়িয়া ছিল সে কথা কহিল না।

বিশ্বেশ্বর ক্রমশঃ তেজ বাড়াইয়া আরও দু'বার প্রশ্ন করিলেন; এবং উত্তর না পাইয়া হাতের চটি মাটিতে নামাইয়া ছাতাটি মুড়িয়া ফেলিলেন, লোকটার কপালে হাত দিয়া দেখিলেন, মুড়ি ভাজা যায় এম্নি তা' গরম; ওষ্ঠাধর শুকাইয়া চড়্ চড়্ করিতেছে; নিঃশ্বাস যেন আগুন! বিশ্বেশ্বর আপন মনেই বলিলেন,—ম'র্‌বে না কি ?

তারপর এদিক ওদিক চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া হাঁক্‌ডাক্ সুরু করিয়া দিলেন; দেখিতে দেখিতে বহু লোক জড় হইয়া গেল। বিশ্বেশ্বর তাহাদের সাহায্যে পীড়িত ব্যক্তিকে গৃহের উঠান পর্য্যন্ত আনিয়াই দ্বিতীয়বার বাধা পাইলেন।

দেখিয়া লোকটাকে হিন্দু বলিয়াই মনে হয়, তবে হিন্দুর মধ্যেও নাকি এমন জাতিও আছে যে উল্লেখযোগ্য জাতির বারান্দায় উঠিবারও অযোগ্য। এখন হঠাৎ সেই প্রশ্নটিই উঠিয়া পড়িল। উঠানে নামাইলে এই ভরা-সন্ধ্যায় দেখিতে অতি বিশ্রী হয়; ক্ষেমঙ্করী তুমুল আপত্তি তুলিয়া তাহা করিতে দিলেন না; কাজেই বেহুঁস্ রোগীকে হাতের উপর করিয়া গ্রামের প্রায় অর্দ্ধেক লোক এমন কোলাহল জুড়িয়া দিল যেন বীরভদ্র বিশ্বেশ্বরের উঠানে পড়িয়া দ্বিতীয়বার দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করিতেছেন। মানুষের বারান্দায় উঠিবার যোগ্যতা তার আছে কি না, এ প্রশ্নের উত্তরটা কেবল সে-ই জানে যাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া এই প্রশ্ন উঠিয়াছে। তর্ক ছাড়িয়া লাঠি মারিয়া বেড়াইলেও আর কাহারও নিকট হইতে উত্তরটা আসিতে পারে না, আশ্চর্য্য এই যে, এতগুলি লোকের মধ্যে এই সরল কথাটি কাহারও মাথায় আসিল না।

একজন বলিল,—গোয়া'লে নিয়ে চল। গোয়া'লের জাত নাই।

বিশ্বেশ্বর চটিজোড়া হাতে করিয়াই দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি গোয়া'লের উল্লেখে হঠাৎ

অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—আমার এতগুলো গরু যাবে কোন্ চুলোয়? ঘরবারান্দা আমার না তোমাদের হে? উঠাও বারান্দায়, তারপর যা' হয় তখন দেখা যাবে।—বলিয়া তিনি ভুলবশতঃ হাতের জুতা মাটিতে নামাইয়া পায়ে দিলেন।

লোকে বিস্মিত হইয়া গেল -বিশ্বেশ্বরের গোয়াল কি তার জাতের চাইতেও বড়!—

লোকটাকে বারান্দায় তোলা হইল; সে বিছানাও একটু পাইল, এবং শুশ্রূষায় ক্রমশঃ তার সংজ্ঞাও ফিরিল। তখন সে তার নাম বলিল, বিন্ধ্যপ্রসাদ, জাতিতে কুর্ম্মী।

কুর্ম্মী জাতটার সঙ্গে গ্রামের লোকের পরিচয় ছিল না। জিজ্ঞাসা করিল,—তোর হাতের জল খাওয়া যায়?

—যায়।—বলিয়া বিন্ধ্যপ্রসাদ আবার চোখ বুজিল।

আঃ, বাঁচা গেল, জাতি রক্ষা হইয়াছে।

তারপর কয়েকদিন ধরিয়া কেবল চিরতার জল খাওয়াইয়া বিশ্বেশ্বর রোগীকে সুস্থ করিয়া তুলিলেন।

বিন্ধ্যপ্রসাদ আত্মজীবনী যাহা বলিল তাহা এই—তাহার পূর্ব্বপুরুষের ঘর ছিল গয়া জিলায়, কিন্তু সে দেশের সঙ্গে সম্পর্ক তার নাই, ছিলও না, দেশের জন্য লালায়িতও সে নয়; বাংলাদেশের মাটিতেই সে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, এই মাটিরই ফলশস্য দানাপানি খাইয়া সে এত বড় হইয়াছে; ভূভারতে আপনার জন কেহ তাহার নাই; মাঠ পার হইয়া, গ্রামের ভিতর দিয়া, নদী পার হইয়া আট ক্রোশ দূর সহরে সে কর্ম্মের অন্বেষণে যাইতেছিল, আরও কয়েকবার সে এ-অঞ্চল দিয়া যাতায়াত করিয়াছে;—এবার মাঠের মাঝামাঝি আসিতেই তার হি হি করিয়া কাঁপাইয়া জ্বর আসে; কোন প্রকারে বহুক্লেশে গ্রামের সীমান্ত পর্য্যন্ত আসিয়া সে গাছের নীচে জ্ঞান হারাইয়া শুইয়া পড়িয়াছিল; তাহার পর মেহেরবান্ ঠাকুরজি গৃহে আনিয়া তাহার জান্ বাঁচাইয়াছেন। আর কোথাও যাইবার তার প্রবৃত্তি নাই, সে এই ঠাকুরজির কাছেই বিনাবেতনেই থাকিবে।—এই সঙ্কল্প নিবেদন করিয়া বিন্ধ্যপ্রসাদ বিশ্বেশ্বরকে বলিল, বাবাঠাকুর; ক্ষেমঙ্করীকে বলিল, মা। শুনিয়া ক্ষেমঙ্করীর মাতৃহৃদয় তৃপ্ত হইয়া গেল।

তিনি হাসিয়া বলিলেন,—কিন্তু তোর ঐ খোট্টাদেশের দাঁতভাঙা নাম ত' আমাদের মুখ দিয়ে বেরুবে না রে। আমরা তোর নাম রাখ্‌লাম, নব।

বিন্ধ্যপ্রসাদ হাত জুড়িয়া বলিল,—যে-আজ্ঞে, মা। আমি আপ্‌নার সন্তান; মা সন্তানকে যে নামে খুসী ডাক্‌বেন।

ক্ষেমঙ্করী বলিলেন,—সেই ভাল। আমার সেই দশ মাসের ছেলেটা বেঁচে' থাক্‌লে

অতবড়ই হ'ত। তার নাম রেখেছিলাম, নব। বলিতে বলিতে ক্ষেমঙ্করীর চোখের কোণ ভিজিয়া উঠিল।

বিন্ধ্যপ্রসাদের চোখও যেন ছল্ ছল্ করিতে লাগিল।

বিন্ধ্যপ্রসাদ নামান্তরিত হইয়া নব ডাকেই সাড়া দিতে লাগিল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই বাড়ীর সকলের কাছেই এই সুসংবাদটা ধরা পড়িয়া গেল যে, নবর মুখই শুধু সাড়া দেয় না, তার অন্তরও যেন সাড়া দিয়া লাফাইয়া উঠে। মানুষের মনের এই বার্ত্তাটির মত সুসংবাদ বড় বেশী নাই; আমারই আহ্বানে সাড়া দিবার জন্য আর একটি অন্তর অনুক্ষণ উন্মুখ হইয়া আছে, শুধু এই অনুভূতিটাই পরম অমৃতময়; মানুষের অদৃষ্টে এই অনুভূতির আস্বাদ বেশী মিলে না।...... দেখিতে দেখিতে ক্ষেমঙ্করীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্য্যন্ত নবর এম্নি বশীভূত হইয়া উঠিল যে, অন্য কাজ করিবার ফুরসৎ পাওয়াই তাহার মুস্কিল হইয়া উঠিল।

ক্ষেমঙ্করী বলিলেন,—ও-রা আবার তোকেই বড়ভাই পেয়েছে।

—যে আজ্ঞে, মা।—বলিয়া নব যেন ধন্য হইয়া গেল।

সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্ট নবর মা ডাকটি। এমন সুর সে কোথায় পাইল কে জানে,—সময় সময় তাহার ডাকে ক্ষেমঙ্করী চম্‌কিয়া উঠেন; তাঁহার সকল হৃদয় মথিত হইয়া একটা অনির্ব্বচনীয় প্রীতির রস ফেনায়িত হইয়া উঠে।...নব খুব কম কথা বলে, হাসেও কম; কিন্তু মেঘের পশ্চাতে সূর্য্য লুকাইলেও তার আলো যেমন একেবারেই নিবিয়া যায় না, তেম্নি নবর কম কথা আর কম হাসির আড়ালে তার অন্তরের প্রসন্নতা কোনোদিনই অস্তমিত হইয়া যায় নাই।...দেখিয়া শুনিয়া বিশ্বেশ্বর সন্তুষ্ট হইলেন; নবর গম্ভীর ক্ষিপ্র বলিষ্ঠ মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া যেমন সাহসে তাঁর বুক ফুলিয়া ওঠে; তার নিখুঁত পরিচ্ছন্ন কর্ম্মপটুতা দেখিয়া তেম্নি তাহাকে ভালবাসিতেও ইচ্ছা করে।

ক্ষেমঙ্করী অসুখে পড়িলেন।

নব 'মা' বলিয়া ডাক দিয়া শতবার তাঁহাকে দেখিতে আসে; কোথায় তাঁর অশান্তি চক্ষের নিমিষে সেটা ধরিয়া ফেলিয়া তাঁহাকে সুস্থ করিয়া রাখিয়া যায়।

ক্ষেমঙ্করী জিজ্ঞাসা করেন,—ওদের সব খাইয়েছিস্, নব?

নব বলে—তুমি কিছু ভেব' না, মা। আমি খাইয়ে দাইয়ে ঠিক করে দিয়েছি। তোমার কাছে এলে তোমায় বিরক্ত ক'র্‌বে বলে' তাদের কাউকে আস্‌তে দেইনে।

—বেশ করিস্। কিন্তু মাঝে মাঝে আস্‌তে দিস্, বড় দেখ্‌তে ইচ্ছে করে যে।

ছেলেমেয়েরা এখন বিশ্বেশ্বরের জ্ঞাতসারেই নবর হাতে খায়; বড় মেয়েটা রাঁধে;

যতক্ষণ সে রাঁধে ততক্ষণ অন্যদিকে মন দিবার সময় বড় পায় না। তাই, দুই একদিন ইতস্ততঃ করিয়া নব ক্ষেমঙ্করীর অনুমতি লইয়া ছোটদের ভাতে হাত দিল।

ক্ষেমঙ্করী বলিলেন.—তুই যে আমার ছেলে রে।—

বিশ্বেশ্বর ভাবিলেন, –বিপদে নিয়মো নাস্তি!

ক্ষেমঙ্করীর ব্যারাম বাড়িয়া উঠিল।

বিশ্বেশ্বর নিজে পত্নীর শয্যাপ্রান্তে বসিয়া ঘুমে ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়েন, কিন্তু নব দিনের পর দিন সারারাত্রি অতন্দ্র নিষ্পলক চক্ষে ক্ষেমঙ্করীর মুখের দিকে চাহিয়া ঠায় বসিয়া থাকে; সহস্রবার উঠিয়া তাঁর আরাম ঔষধ পথ্য জোগায়।

কিন্তু ক্ষেমঙ্করী বাঁচিলেন না।

ক্ষেমঙ্করীর মৃত্যু হইলে নব মা মা বলিয়া লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল: ছেলে-মানুষের মত শতবার সে বিশ্বেশ্বরকে প্রশ্ন করিতে লাগিল,—বাবাঠাকুর, মা আমার কোথায় গেল?

গ্রামের লোক বিশ্বেশ্বরকে শান্ত করিল, কিন্তু নবকে শান্ত করাই দুরূহ হইয়া উঠিল।...... তারপর নব শোকসম্বরণ করিয়া ছোটদের আগ্‌লাইয়া রহিল; শব শ্মশানে চলিয়া গেল।

ইহার পর দুইদিন বাড়ীতে থাকিয়া বিধবা ভগিনীর জিম্মায় ছেলে-মেয়েদের রাখিয়া বিশ্বেশ্বর অনুচর নবকে লইয়া ভিক্ষায় বাহির হইলেন।

বিশ্বেশ্বরের তল্পীটি লইয়া নব তাঁহার পিছন্ পিছন্ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে নিঃশব্দে অবিশ্রান্ত ঘুরিতে লাগিল।—

বিশ্বেশ্বর বাড়ীতে নবর প্রভু ছিলেন, কিন্তু বাড়ীর বাহিরে নব তাঁহার যে মূর্ত্তি দেখিল, বাড়ীর সেই চেহারার সঙ্গে তাহার কোথাও মিল নাই... ..

বিশ্বেশ্বর এখন ভিক্ষার্থী, অত্যন্ত করুণ তাঁর কণ্ঠ; এমনি তাঁর বিনীত নিস্তেজ ভাব যে, যাহাকে স্বয়ং পদধূলি দিতেছেন, যেন তিনি তাহারও পদানত।

বিশ্বেশ্বরের এই দুর্দ্দিনে তাঁহার অশিক্ষিত নিরক্ষর শিষ্যরা যে উদারতা দেখাইল তাহা বাস্তবিকই ভাবিবার বিষয়।—শিক্ষিত যাঁরা, যাঁরা গুরুপুরোহিতের তোয়াক্কা না করিয়া, ধর্ম্মানুষ্ঠান বিকল্পে সিদ্ধ করাটাই মার্জ্জিত রুচির পরিচায়ক বলিয়া মনে করেন, বিশ্বেশ্বরের টাকার থলিটা এখন দেখিলে তাঁহাদের জ্ঞাননেত্র বিকশিত হইয়া যাইত।

পূরা সাতশত টাকা বিশ্বেশ্বরের সংগ্রহ হইল,—এতগুলি টাকা থলিটায় তুলিলেন বিশ্বেশ্বর শুধু পদধূলি আর ধৃতোপবীত আশীর্ব্বাদ দিয়া।......

অৰ্দ্ধলক্ষ্মী কৃষিকর্ম্মে এবং বাংলার সেই লক্ষ্মী যে মাঠে আর বিলে তাহাতে আর যাহারই সন্দেহ থাক্ বিশ্বেশ্বরের নাই।

নব নিঃস্পৃহের মত চাহিয়া চাহিয়া এই টাকা আদায় করা দেখিল; দেখিয়া তাহার মনের গতি কোন্‌দিকে ফিরিল কে জানে; ফিরিবার পথে চলিতে চলিতে সে যেন ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হইয়া উঠিতে লাগিল। মানুষ পরমাত্মীয়কে পোড়াইয়া যেমন করিয়া শ্মশান হইতে ফেরে গতি তার তেমনি মন্থর; স্বচ্ছ সন্তোষের যে স্ফূর্ত্তি তাহার চোখেমুখে হাল্কা হাওয়ার মত দিবারাত্র ঢেউ খেলিত তাহা যেন সহসা থমকিয়া গেছে······

বিশ্বেশ্বরের পা পড়িতে লাগিল খুব ফাঁক্ ফাঁক্; এতগুলি আমদানী সঙ্গের থলিতে বোঝাই —বিশ্বেশ্বরকে কিসে যেন ঠেলিতে ঠেলিতে লইয়া চলিল। লুঠ্‌তরাজের ভয় একটা আছেই —সন্ধ্যা আসন্ন হইয়া উঠিতেছে, সঙ্গে এতগুলি টাকা; যে দিক্ দিয়াই হোক কেহ লাঠি কাঁধে করিয়া আসিয়া সামনে দাঁড়াইলেই থলি সমেত টাকাগুলি তাহার হাতে বিনাবাক্যে তুলিয়া দিতে হইবে; এখনও প্রায় দু'ক্রোশ পথ চলিতে হইবে, তার দেড়ক্রোশই জনশূন্য প্রান্তর; সঙ্গে নব আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু একজন না আসিয়া যদি ঠ্যাঙাড়েরা পাঁচজন আসে তবে একা নবই বা তখন কি করিয়া রক্ষা করিবে!—ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে ব্যস্ত হইয়া বিশ্বেশ্বর যথাসাধ্য তীরের মত চলিতে লাগিলেন; ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন, নব তল্পী লইয়া ঠিক সঙ্গেই আছে।

সূর্য্য যখন অস্ত গেল তখন বিশ্বেশ্বর মাঠের মাঝামাঝি আসিয়াছেন;······এবার চৈতালীতে সোনা ফলিয়াছে--

বিশ্বেশ্বরের বর্গাভাগে কিছু জমি ছিল।—

ডা'লটা এবার সম্বৎসর কিনিতে হইবে না, ফসল ফলিয়াছে ভাল; ডা'লেরও কি কম খরচ; মানুষ শুধু খাইয়া খাইয়া ফতুর হইয়া গেল; খাওয়ার খরচ না করিতে হইলে টাকা জমিত কত!—ব্যাটারা আবার ফাঁকি দেয়; বিঘা ভুঁই দশ মণ ফলিলেও যা, দু'মণ ফলিলেও তাই; ব্রাহ্মণকে ফাঁকি দিয়া এ পর্য্যন্ত কাহার কি সুসার হইল তাহাও ত' দেখা যায় না!—এবার দেখিয়া শুনিয়া ভাগটা আদায় করিয়া লইতে হইবে। খাতকরা কেবল খত বদ্‌লাইয়া দিয়া থামাইয়া রাখে, অথচ সুদ এক পয়সা দিবার নামটি নাই; যেন তামাদি রক্ষা হইলেই মানুষ কৃতার্থ হইয়া যায়। এবার সুদ আর

আসলেও কিছু না দিলে তিনি ছাড়িবেন না; তবে নালিশের বড় হাঙ্গামা, ঘরের টাকা গোড়াতেই—

হঠাৎ নব ডাকিল,—ঠাকুর!

চিন্তাসূত্র ছিঁড়িয়া বিশ্বেশ্বর চমকিয়া উঠিয়া থামিয়া পড়িলেন; ত্রস্তনেত্র ঘুরাইয়া চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন—যে-ভয় করিতেছিলেন সেই ভয়-ই আগত বুঝি; কিন্তু তা' ত' নয়।...... তাঁহারা দু'টি প্রাণী ভিন্ন প্রান্তর তেমনি জনপ্রাণহীন, নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মত নিঃশব্দ; এক ঝাঁক্ পাখী মাথার উপর দিয়া দিগ্বলয়ের দিকে ছুটিতেছে; অস্তগত সূর্য্যের আলোকাঙ্কনগুলি মিলাইয়া আকাশের প্রান্তে অন্ধকার জমিয়া আসিয়াছে......

তাড়াতাড়ি বাড়ী পৌঁছিতে পারিলে বিশ্বেশ্বর বাঁচেন—বেটা অকারণে ডাকিয়া বাধা দেয় কেন?

বিশ্বেশ্বর নিরুত্তরে চলিতে সুরু করিলেন।

নব আবার ডাকিল,—ঠাকুর!

চলিতে চলিতেই বিশ্বেশ্বর বিরক্তভাবে উত্তর দিলেন,—কেন রে?

নব বলিল,—পালাও।

সে কি!......চলিতে চলিতেই বিশ্বেশ্বর আবার চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন, তৃতীয় মানুষের নাম-গন্ধও নাই। বেটা ক্ষেপে গেল নাকি? দাঁড়াইয়া নবর কথাটার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় তাঁহারই পশ্চাদ্দিক হইতে যে ব্যক্তি অকস্মাৎ ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল, বিশ্বেশ্বর কাঁপিয়া উঠিয়া দেখিলেন, সে নব। বিশ্বেশ্বরের না থামিয়া আর চলিল না, থামিয়া চোখ তুলিয়া দেখিলেন, নবর চোখের দৃষ্টি যেন কাঁপিতেছে, মুখে তাহার রক্তের লেশমাত্রও নাই।......বিশ্বেশ্বর বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—কি রে? কি হ'য়েছে?

নব নিঃশব্দে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

—বল্, কি হ'য়েছে। ভয় পেয়েছিস্?—বলিয়া বিশ্বেশ্বর গায়ত্রী স্মরণ করিলেন। এই মাঠেরই কোন্ দিকে যেন শ্মশান আছে, এবং এ-দিকে ভূতের ভয় আছে বলিয়াই জনশ্রুতি; সন্ধ্যার পর এদিকে সচল অগ্নিপিণ্ড অনেকেই দেখিয়াছে। তিনি এটাও এখন লক্ষ্য করিলেন যে, তাঁহার তল্পীটা নবর হাতে নাই, তাহার নিজের লাঠিখানাও ফেলিয়া দিয়া সে ছুটিয়া আসিয়াছে।—বিশ্বশ্বরের গায়ে কাঁটা দিল। বলিলেন,—কি হয়েছে বল্‌না রে? দুর্গা, দুর্গা, ভালোয় ভালোয় মাঠটা পার হ'তে পারলে বাঁচি। কি, হ'ল কি তোর?

নব প্রত্যুত্তরে আগের কথাটাই আবার বলিল। সোজা তাঁহারই দিকে চাহিয়া বলিল,—পালাও।

—পালাব কেন ?

—তবে পালিও না।– বলিয়াই নব বাঁ-হাত দিয়া বিশ্বেশ্বরের ডান হাতখানা চাপিয়া ধরিল। বলিল,—টাকা দাও, না দিলে—বলিয়া ডানহাত বাড়াইয়া যে জিনিষটা সে বিস্ময়ে-অবাক্ বিশ্বেশ্বরের নিষ্পলক চোখের সম্মুখে অকস্মাৎ তুলিয়া ধরিল, সেটা যেন সর্ব্বনাশীর একটিমাত্র দাঁত ; ভয়ঙ্কর ধারালো, ঝক্‌ঝকে'।……ছোরা দেখিয়া বৃদ্ধ বিশ্বেশ্বরের শীর্ণদেহ আর খাড়া থাকিতে পারিল না ; কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি নবর পায়ের তলায় বসিয়া পড়িলেন ; টাকার থলিটা তাহার দিকে তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন,—টাকা নে, কিন্তু প্রাণে মারিস্ নে, বাবা।

—সে হয় না।—এই কয়টি কথাই শুধু বিশ্বেশ্বরের কানে গেল……

মুহূর্ত্তের জন্য একটা তীব্র ব্যথার অনুভূতি তাঁহার মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত বিদ্যুদ্বেগে বহিয়া গেল।

তারপর তিনদিন পরে যখন তিনি বিছানায় শুইয়া চোখ মেলিলেন তখন তাঁহার সেই সাতশ' টাকার থলিটা আর নব সেখানে অনুপস্থিত।

প্রলয়ঙ্করী ষষ্ঠী—

চোখ দুটা তার গোল আর লাল; আড়ে দীঘে সে প্রকাণ্ড; কিন্তু আকার আর চেহারার চেয়ে ভয়ঙ্কর তার কথা।

সদু খাঁ কথা কয় খুব আস্তে আস্তে, চাপা গলায়; তার কথায় আর চেহারায় এমনি গরমিল যে তাহার কথা শুনিলেই খাঁ করিয়া মনে হয়, আগুন ধোঁয়াইতেছে।

বাস্তবিক কথাগুলা তার ধোঁয়ার মতই—যেন হাল্কা; কিন্তু ভিতর হইতে কখন যে আগুনের জিব বাহির হইয়া আসিবে তাহারই দিশা না পাইয়া লোকে তাহার সামনে একেবারে কুঁচকিয়া যায়। যে কয়জন পেয়ারের মানুষ তার আছে, সদুর লোক বলিয়া তাহাদের দাপটও কম নয়, অথচ তাহারাই আবার তার সামনে শীতের ব্যাঙের মত গুটাইয়া থাকে।......

সদু খাঁ আগে গাঁওয়াল করিত—

মানে, কোমরের ঘুন্সী, তামার তাবিজ, সূতোর গুলি, সূঁচ, টিনের আয়না, চিরুণী, কাঠের কৌটা, খেলনা—এই সব মণিহারী জিনিষ মাথায় করিয়া গাঁয়ে গাঁয়ে ফিরি করিয়া বেড়াইত।......

তারপর সে সুরু করিল ফড়ের কাজ—

পাট, তিসি, সর্ষে, রাই, ধান, ধনে, গম, তিল, কলাই—এইসব যখনকার যা ফসল, গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরিয়া দশ বিশ সের সংগ্রহ করিয়া আড়তে আনিয়া দিত।......

তারপর হইল সে ব্যাপারী—

মানে, মহাজনের নৌকা পাট কি ধান বোঝাই হইয়া যায় মোকামে, সদু খাঁ সেই নৌকার আর মালের ভার লইয়া কর্ত্তা হইয়া নৌকায় যাওয়া আসা করে।......

অতঃপর হাজার-মণে' এক পালোয়ারী নৌকা কিনিয়া সে নিজেই মহাজন হইয়া গদিতে বসিল।......

পয়মন্ত লোক, দেখিতে দেখিতে পড়্‌তা ফিরিয়া গেল। অনর্গল পয়সা হাতে আসিতে লাগিল।

কিন্তু লোকটার বজ্জাতি গেল না।

······সে হাটে যায়, বাজারের সেরা মাছটার চোয়াল ধরিয়া তুলিয়া অনর্থক জিজ্ঞাসা করে,—কত ?

জেলে বলে,—আড়াই টাকা।

সদু বলে,—আড়াই টাকা ? বেশ সস্তা ত ! বলিয়া চাকরের হাতে মাছটা দেয়।

······বিদেশী যদি কেহ সেখানে থাকে, সে ভাবে, বুঝি সত্যই সস্তা সদুর কাছে ; কিন্তু যে চেনে সদুকে সে মনে মনে হাসে ; জেলে কাঁপিয়া ওঠে।······

সদু যাবার বেলা আটগণ্ডা পয়সা জেলের চুপ্‌ড়ীর ভিতর ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যায় ; যথা-লাভ মনে করিয়া করিয়া জেলে তা-ই ট্যাঁকে রাখে।

সুদখোর নিধিরাম দত্তর ঘরে সেদিন আগুন লাগিয়া গেল।

এমন প্রায়ই হয়।

গ্রামে ছোট-খাটর মধ্যে এ-ও একটা ব্যবসা।

দেশলাইয়ের কাঠিটা জ্বালিয়া চালের উপর ফেলিয়া দিলে, আগুন লাগুক আর নাই লাগুক,—তার দাম এক্ টাকা।

খড়ের ভিতর জ্বলন্ত টিকে গুঁজিয়া দিলে—তিন টাকা।

ঘরের চার কোণেই আগুন দিলে—পাঁচ টাকা।

ঘরের ভিতরকার মানুষ বাহির হইতে না পারে, এম্‌নি করিয়া বাহির হইতে দরজা বন্ধছন্দ করিয়া আগুন দিলে—দশ টাকা।

সদু খাঁ ছিল এই-সবের সর্দ্দার।

কিন্তু ইতিমধ্যেই মস্ত ব্যবসাত্ বলিয়া চারিদিকে নাম পড়িয়া গেছে।

নৌকা হইয়াছে তিন খানা। ওদিকে ঢাকা, ওদিকে রাজমহল, ওদিকে কল্‌কাতা পর্য্যন্ত তার মাল খরিদ-বিক্রী হয়।

দোতালা দালানও উঠিয়াছে, বিশটা কুঠুরী তার। বৈঠকখানা, ফরাস্, তাকিয়া, গড়্‌গড়া, ফুর্সী, অম্বুরী তামাক, পিতলের বদ্‌না,—সবই হইয়াছে। দাসী বাঁদী খান্‌সামা,—তাও দশ বিশটার কম নয়। বিবিও জুটিয়াছে—গোটা পাঁচেক—সোয়া গণ্ডা।

বিবিদের মহাল সব আলাদা আলাদা। এক এক বিবির খাসে দুই দুই বাঁদী।

দাসী বাঁদী বিবি—সকলের গর্ভেই ছেলে মেয়ে জন্মগ্রহণ করিতেছে।······তিনচার বছরেই সদু খাঁর অত বড় বাড়ী নোংরামিতে আর গোলমালে জংলা পায়রার আড্ডাকেও ডিঙ্গাইয়া গেছে।

নৌকার ক্ষেপে ক্ষেপে সদু টাকা ঘরে আনে চার পাঁচ হাজার ; কিন্তু একটি অভ্যাস

সে কোনও দিন ছাড়ে নাই। একখানা না একখানা নৌকায় সে প্রতিবারে যায়ই; একবার এখানা, একবার ওখানা, এই রকম করিয়া তিনখানাতেই সে পালাপালি করিয়া বেড়ায়। সঙ্গে থাকে গোটা দুই দাসী বাঁদী, আর তার কয়েল চৈতন্য। চৈতন্যর মত অমন ধারা ভয়ঙ্কর পাকা লোক সহজে চোখে পড়ে না; ফি দাঁড়ির ঝুলে দেড়সের পর্য্যন্ত সে চুরি করিতে পারে, এম্‌নি তার সাফাই হাত!—

কালিগঞ্জের বাজারের ঘাটে সদু খাঁর নৌকা গেরাপি করা আছে। পাটের গাঁট নামিয়া ঘাটেই কামানে ওজন হইয়া মহাজনের গুদামে উঠিয়া যাইতেছে।

বাজারের ঘাটের খানিকটা উত্তরেই স্নানের ঘাট।......

নৌকার ছইয়ের উপর বসিয়া ছাতি মাথায় দিয়া মালের নামা-ওঠা দেখিতে দেখিতে সেই স্নানের ঘাটের দিকে হঠাৎ চাহিয়া সদুর মনে হইল—বাঃ, বেশ বৌটি ত!—

বিশ বাইশ বছরের একটি বৌ জল লইতে আসিয়া ঘোমটা একটু তুলিয়া সদুরই পাটের গাঁট ওজন করা দেখিতেছিল।......

রাঁধাবাড়ার জন্য সঙ্গে যে বাঁদী দুটা আসিয়াছিল তাহাদেরই একটাকে ডাকিয়া বৌটার পিছন ধরাইয়া দিল।

বাঁদী বৌ-এর বাড়ী চিনিয়া আসিয়া গোপনে সদুকেও সেই বাড়ীটা দেখাইয়া দিল।

সদু তার পরদিন হাঁটিতে হাঁটিতে ঠিক্ তার পাশের বাড়ীটাতে গিয়া উঠিল। বাহিরের উঠানে দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতেই বাড়ীর লোকে সমাদর করিয়া তাহাকে ডাকিয়া লইয়া জলচৌকির উপর বসাইল। বড় একজন কার্‌বারী সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়া তাহারা সদুর মুখ চিনিত: তাই খাতির করিয়া পান দিল, তামাক দিল। কিন্তু তামাক খাওয়া সদুর ভাল করিয়া হইলই না,—হুঁকা টানিতে টানিতে সহসা দুটি গণ্ড বাহিয়া তার চক্ষের জল অবিরলধারে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।......বাড়ীর লোক অবাক্ হইয়া গেল।

জিজ্ঞাসা করিল,—আপনি কাঁদ্‌ছেন কেন?

সদু বলিল,—কাঁদ্‌ছি ভাই, বড় কষ্টে। যাকে আর কোনোদিন দেখব বলে মনে আশা ছিল না, আল্লার দোয়ায় তাকেই আমি দেখেছি।

উপস্থিত সকলেই হা করিয়া রহিল।

সদু বলিতে লাগিল,—তাকেই আমি দেখেছি, ভাই। সে আমার বোন্। নদীর ঘাট থেকে জল নিয়ে গেল একটা বৌ......হঠাৎ তাকে দেখেই আমার বুক ছ্যাঁৎ করে উঠ্‌ল,

এ কাকে দেখ্‌লাম! ঠিক আমার সেই মরা বোন্‌টি, যেন বেহেস্ত্‌ থেকে ফিরে এসেছে; তেম্‌নি রূপ, তেম্‌নি গড়ন, পা ফেলাটা পর্য্যন্ত ঠিক্‌ তারই মতন, একেবারে সে-ই।

বলিয়া সদু হুঁকা ফেলিয়া আরো কাঁদিতে লাগিল।

একজন বলিল,—ও-বাড়ার জসিমের বৌ, সে-ই খুব সুন্দর।

সে-দিন ঐ পর্য্যন্ত—

সদু কাঁদিয়া কাটিয়া চলিয়া আসিল।

কিন্তু কথাটা জসিমদের কানে উঠিল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। তাহারা সদুর নৌকায় যাইয়া দেখা করিল; বলিল,—যাবেন একবার মেহেরবানি করে গরীবের বাড়ী, বসে আস্‌বেন।

তার পরদিন সদু দুই হাঁড়ি খাজা বাতাসা আর দুই হাঁড়ি জিলিপী লইয়া জসিমদের বাড়ী আসিয়া হাজির।

আদর আপ্যায়ন দস্তুরমতই হইল,—বোনের বাড়ী ভাই আসিলে যেমন হওয়া দরকার।

বোনের ছেলেটিকে কোলে লইয়া সদু আর ছাড়িতে চায় না, এম্‌নি স্নেহ! বোনের ছেলেবেলাকার গল্প, বড় হওয়ার গল্প, আর সুখ্যাতি যা করিল তা-ও ঢের।......

আরও হাঁড়ি চার পাঁচ খাজা বাতাসা জিলিপী ভাগনের নামে পাড়ার লোককে খাওয়াইয়া সদু নৌকা লইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

দিন পনর পরেই সদুর লোক আসিল জসিমের বাড়ী প্রায় শ-খানেক টাকার কাপড় চোপড় লইয়া—

বোনের কাপড়, রুমাল; ভাগ্‌নের কাপড়, জামা, জুতো, রাঙা ছাতি; জসিমদের তিন ভাইয়ের কাপড়, জামা, জুতো, গামছা, ছাতি;—আরো মিঠাই হরেক রকমের। সঙ্গে চিঠি আসিল—বোনের জন্য প্রাণ চব্বিশ ঘণ্টাই হু হু করে।

জসিমের বাড়ীতে রীতিমত চেঁচামিচি লাগিয়া গেল,—এ আহ্লাদ রাখি কোথায়! এতগুলো—এই-সব একেবারে আমাদের।......

লোকে বলিতে লাগিল—যাক্‌, এত দিনে জসিমের দুঃখু ঘুচল শালাকে পেয়ে। আর কোমর জলে দাঁড়িয়ে পাট পোঁচাতে হবে না—

কিন্তু এত পাওয়ার পাল্‌টা দেওয়া ত কিছু চাই-ই, তবেই মুখরক্ষা হয়,—কিন্তু জসিমদের

অবস্থা, ভাত জোটে ত নুন জোটে না মত,—কষ্টেস্বষ্টে সের পাঁচেক বাতাসা ছাড়া আর কিছুই পাঠান হইল না।

তবে ইহাতে জসিমদের আক্ষেপ করিবার কিছুই রহিল না। সের পাঁচেক বাতাসা পাইয়াই সদু এমন আরজ পাঠাইল, যেন সে সোনার খনির মুখ খোলা পাইয়াছে।

এমনি করিয়া লেন-দেনের প্রণয় চলিতে চলিতে হঠাৎ একদিন সদুর বাড়ী একটা বিবাহ কেমন করিয়া যেন আসন্ন হইয়া উঠিল।

জসিমের বাড়ীতে সদুর পিয়াদা চিঠি লইয়া আসিল; আর আট বেহারার এক পাল্কী, জন দুই পাইক্, এক দাসী আসিল বোনকে লইতে।

চিঠিতে লেখা ছিল,—

জসিম ভাই, আমার ছোট ভাইয়ের সাদি, অমুক তারিখে; বোনকে অবশ্য পাঠাবে। সাদির আর আট দিন আছে—তোমরা তার দু'একদিন আগেই রওনা হয়ে আস্‌বে, তাতে অমত বা অন্যথা করবে না।......

জসিমের বৌ পাল্কী চড়িয়া আগে পাছে পাইক্ পেয়াদা আসাসোটা লইয়া হুম্ হুম করিয়া সদুর বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। জসিমের ছোট ভাই কাসেম, পনর ষোলো বছরের ছেলে,—সেও সঙ্গে আসিল।—পাল্কী সটান্ অন্দরের দরজায় আসিয়া নামিল; দাসীর সঙ্গে জসিমের বৌ ভিতরে চলিয়া গেল।

বিয়ে যেদিন হইবার কথা তার তিনদিন আগে সদু কাসেমকে ডাকিয়া বলিল,—বিয়ে এ তারিখে হ'ল না হে; লোক সঙ্গে দিচ্ছি, তুমি এখনকার মত বাড়ী যাও; জসিম ভাইকে বলো, বিয়ের আগেই তারা ঠিক খবর পাবে।

কাসেম বলিল,—বৌ?

—বৌ কিছু দিন থাক্‌বে এখানে। তার ব্যবস্থা পরে করব।

কাসেম চলিয়া গেল।

কিছুদিন যাইতেই জসিমেরা বৌএর জন্য একটু ব্যস্ত হইয়াই উঠিল। তার উপর, পরের বাড়ী যাইয়া এতদিন থাকা, হাজার দহরম মহরম কুটুম্বিতাই থাক্, ভাল দেখায় না।

কাজ কামাই করিয়াই অবশেষে জসিম একদিন সদুর বাড়ী আসিল।—

জসিম সদুর বৈঠকখানার দাওয়ায় বসিয়া আছে, মনে মনে ভাবিতেছে, বাপ্‌রে কত বড় বাড়ী! এমন সময় বাড়ীর মালিক আসিতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইল। আপ্যায়িত হইয়া জসিম একটু হাসিলও; কিন্তু ভুরু তুলিয়া সদু বলিল, কি চাও? .....যেন জসিমকে চেনেই না এমনি সদুর আল্‌গা ভাব।

জসিম ভাবিল, বড়লোকেরা বুঝি এই রকমই ঠাট্টা করিয়া থাকে; তাই আরও খানিকটা হাসিয়া বলিল,—ভাই আমাকে চিন্‌তে পার্‌লেন না?

-না হে না, কে তুমি? তোমার বাড়ী কোথায়?

সদুর রাগ দেখিয়া জসিমের মনে হইল, এ-টা বড় লোকের ঠাট্টা না-ও হইতে পারে। সে অবাক্ হইয়া গেল। একটু থামিয়া গুছাইয়া লইয়া বলিল,—আপনার নামই ত' সদু খাঁ?

—হাঁা, আমারই নাম সদু খাঁ।

—তবে চিন্‌তে পার্‌লেন না কেন বুঝতে পার্‌ছিনে। আমার নাম জসিম কারিকর, বাড়ী কালিগঞ্জ।

সদু বলিল,—কালিগঞ্জ চিনি বটে, কয়েকবার যাওয়া আসা করেছি; কিন্তু তোমাকে ত চিনিনে। সে কথা মরুকগে—এখন কি দরকারে এসেছ এখানে?

জসিম বলিল,—আমার স্ত্রী—

—পালিয়েছে বুঝি?

শুনিয়া জসিম যেন আর থই পায় না; সদুর মুখের দিকে খানিকক্ষণ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল,—আপনি তাকে নিয়ে এসেছেন

সদু যেন আচম্‌কা বাঘ ডাকিয়া উঠিল,—জেন্দার—

'হুজুর' বলিয়া সাড়া দিয়া ঝাঁকড়া চুল ঘুরাইয়া খিদমৎগার জেন্দার আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়াই জসিমের কোমর জলে দাঁড়াইয়া পাট পোঁচাইবার পরও হাতে পায় যেটুকু বল ছিল তাহাও অবশ হইয়া গেল। জেন্দারের ভ্রমরের মত মিস্‌মিসে কালো তেলমাখানো দেহখানার দিকে চাহিয়া জসিমের জিবটা একটু নড়িয়া গলার মধ্যে হিক্কার মত একটা শব্দ হইল,—আল্লা হক্।

সদু জসিমের দিকে আঙ্গুল তুলিয়া বলিল,—এই বেটা পাগল। বল্‌ছে, আমি ওর বৌকে নিয়ে এসেছি। বাঁদীর বাচ্ছার কান দুটো কেটে রেখে নদী পার করে দিয়ে আয়।

—'যো হুকুম' বলিয়া জেন্দার আগাইয়া আসিতেই জসিম ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল; হাত দুটি জোড় করিয়া বলিল,—দোহাই হুজুরের, মা বাপ, রক্ষে করুন।

সদু বলিল,—যা তবে, আর পাগলামী করিস্‌নে।

কেমন করিয়া খোঁজ পাইল কে জানে--

জসিম আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল ঠিক মানুষটির সাম্‌নে।......

অর্জ্জুন নমঃশূদ্র। সত্তর বছরের বুড়ো।

ঘটনা সব শুনিয়া অর্জ্জুন বলিল,—তুমি থানায় যাও; আমরা কি করতে পারি?

কিন্তু জসিম সে কথা কিছুতেই মানিল না; বারবার সে একই কথা বলিতে লাগিল,—তোমরা একবার চলো সদুর কাছে, তোমরা বললেই সে আমার বৌকে ছেড়ে দেবে।

.....বেচারা তখনো জানে না যে, সদু তার বৌকে নিকা করিয়া তাহারই ঘরে থাকে।

জসিম কাঁদিয়া কাটিয়া অর্জ্জুনের পা ধরিতেই যায়।

অর্জ্জুন বলিল,--চলো যাই, দেখে আসি, কিন্তু ব্যাপার অল্পে মিট্‌বে না। তুমি তাকে চেন না।

জসিমের সঙ্গে অর্জ্জুনকে দেখিয়াই সদু হাসিয়া বলিল,—কি বাবা রাম, হনুমান নিয়ে এসেছ?

এই হইল তার প্রথম কথা।

......তারপর দুইপক্ষের অনেক কথাই হইল, চটাচটির মতই—

সদু এ-কথা বলিল না যে জসিমের বৌ তার বাড়ীতে নাই, আছে যে তাও বলিল না সে—কথাটি এড়াইয়া নবাগতদের সে এই বলিয়া কেবলই ধমকাইতে লাগিল,—মুসলমানে মুসলমানে আমাদের যা-ই হোক্‌, তোরা তার মধ্যে কোথাকার কে?......

জসিম ত ভয়ে কথাই বলিল না।

তারপর শেষ কথা সদু বলিল, জাত ভুলিয়াই বলিল,—তোদের আক্কেল হয় জুতো খেলে; অনেকদিন বুঝি তা মাথায় পড়ে না?

অর্জ্জুনের মুখের দিকে চাহিয়াই তাহার বড় ভাইপো যুধিষ্ঠির তাহাকে টানিয়া বাহিরে আনিল; আনিবার সময় চেঁচাইয়া বলিয়া আসিল,—এ-মাম্‌লা মিট্‌বে লাঠির ঘায়ে। খবর দিও কবে চাও।

সদুও চেঁচাইয়া বলিল,—আচ্ছা।

দু'পক্ষই জানিল, একটা মারামারি হইবেই।

যুধিষ্ঠিররা দলে প্রায় পঁচিশ জন। সবাই অর্জ্জুনের সাগরেদ।

খবর পাঠাইলে আরও কিছু লোক পাওয়া যায়। কিন্তু অর্জ্জুন তাহা হইতে দিল না; বলিল,—তারা দু'শোর বেশি ত নয়।......

বাহিরের মধ্যে দলে রহিল কেবল জসিমরা তিন ভাই। তারাও কেবল দেখিয়ে। লাঠি তাহাদের ধরিতে দেওয়া হয় নাই।

মারামারির জায়গা ঠিক হইল, নমঃশূদ্র পাড়ার নীচেকার গোচারণের ঐ মাঠটা। সেটা কিন্তু সদুরই প্রস্তাব।—বোধ হয় তার ইচ্ছা ছিল, ইহাদের মারিতে মারিতে ঠেলিয়া বাড়ীতে তুলিয়া দিয়া সেই ঝোঁকেই ঘর বাড়ী পর্য্যন্ত সাপাট্ করিয়া দিবে।

যুধিষ্ঠির একবার আপত্তি করিল: কিন্তু অর্জ্জুন বলিল,—না, ঐখানেই হবে।

দিন ধার্য্য হইল।......

ধার্য্যদিনে উহারা আসিল। গুন্‌তিতে দু'শো হইবেই, তার বেশি ছাড়া কম নয়।

ইহারা মাত্র বাইশ জন। বাইশটি ঋজু সুগঠিত বৃষের মত সুদৃঢ় দেহের প্রত্যেকটি অংশে দুর্জ্জয় সংযত শক্তি; আপাদমস্তকে কোথাও জড়তা নাই।—সকলেরই গলায় রুদ্রাক্ষির মালা, পরণে রক্তাম্বর, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, হাতে একখানা করিয়া চারহাত লম্বা লাঠি।

সবাইকে একত্র করিয়া অর্জ্জুন বলিল,—তোরা খুব আস্তে আস্তে এগিয়ে যা, আমি আসছি।...বলিয়াই সে ঘরে ঢুকিল।

সেখানে মাটিতে চাপিয়া বসিয়া মিনিট পাঁচেক চোখ বুঁজিয়া থাকিয়া, তারপর 'মা মা' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে যখন সে চোখ খুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন তার সে পূর্ব্বের চেহারা একেবারে বদ্‌লাইয়া গেছে।—এখন সে যেন শিবের সংহার-মূর্ত্তি।

এইবার সে বাহিরে আসিল। সচরাচর যেন চলিতে পারে না, এম্‌নি সে জবুথবু; কিন্তু এ-সময়ে যেন রক্তের গন্ধে সে ছুটিয়া চলে। তার হাঁকে বাঘেরও পিলে চমকায়, এম্‌নি গলার বেগ!—তার লৌহকঠিন পেশীবর্ত্তুলগুলির তরঙ্গের শৃঙ্গে শৃঙ্গে তটে তটে—তাদের সঞ্চরণে আকুঞ্চনে সম্প্রসারণে যেন রুদ্রের তেজ নাচিতে থাকে!......

'মা মা' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে ছুটিয়া আসিয়া অর্জ্জুন বলিল,—সঙ্গে আয়।—বলিয়াই হাঁক ছাড়িয়া মাঠে যাইয়া পড়িল।......

তারপর যে কি হইল তাহা ভাল করিয়া বলিতে পারিব না।—

……এক একটা ঝড় এমনি আসে—খালি একটা সোঁ সোঁ শব্দ; অন্ধকারে হঠাৎ চোখ বুঁজিয়া যায়; চোখ খুলিয়াই দেখি, হাত পা ছেঁড়া গোটাকতক মানুষ পড়িয়া আছে, চোখের সাম্‌নে আর সব ফাঁকা……সেই রকমই একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল চক্ষের নিমেষে।

মারামারি যখন থামিল, তখন সেই বাইশজনেরই মনে হইল, কতকাল পরে তারা যেন মাটিতে ফিরিয়াছে।

অর্জ্জুনরা ক'জন ছাড়া মাঠে তখন্ আর কেউ নাই। জসিমরা তিন ভাই দূরে দাঁড়াইয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে।

* * * * *

জসিম তার বৌকে ফিরিয়া পায় নাই।

বৌ নিজেই আসিতে চায় নাই।

"* *পয়োমুখম্"—

কলাপ সমাপ্ত হইয়া গেছে, মুগ্ধবোধ আরম্ভ হইয়াছে।

ভূতনাথের কথা বলিতেছি—

ভূতনাথ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছে ; কিন্তু কলাপই বলুন মুগ্ধবোধই বলুন, পাঠে তেমনি ভক্তি কি আগ্রহ তার নাই।···মাঝে মাঝে সে ঠোঁট উল্টাইয়া মুখ বিশ্রী করিয়া ব্যাকরণের দিকে চাহিয়া চুপ্‌চাপ্‌ বসিয়া থাকে।......

ভূতনাথের পিতা কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণকান্ত সেনশর্ম্মা কবিভূষণ মহাশয় স্বয়ং পুত্রকে শিক্ষাদান করিতেছেন।

কিন্তু আরম্ভে একটু বিলম্ব ঘটিয়া গেছে—

ভূতনাথের বয়স গত অগ্রহায়ণে অষ্টাদশ উত্তীর্ণ হইয়া ঊনবিংশে পদার্পণ করিয়াছে।

......সন ১৩০১ সালে তার জন্ম।

ভূতনাথের মেধা কোনোদিনই তার নিজের অলঙ্কারের কি গুরুবর্গের অহঙ্কারের বস্তু হইয়া ওঠে নাই।—

তা' না হোক্‌······

মেধা মানবজাতির পৈত্রিক সম্পত্তি নয় ; আর, ভগবান গৃহ-বিবাদে সালিশী করিতেও বসেন নাই যে, মাম্‌লা বাঁচাইতে ভাণ্ডারের সমস্ত মেধা সবাইকে নিক্তির তৌলে সমান করিয়া মাপিয়া দিবেন! কিন্তু মেধা না থাকার পিছ্‌টানটা যাহার দ্বারা কাটাইয়া উঠিয়া মানুষের গতি-বেগ আর হৃদয়াবেগ সম্মুখের দিকে বাড়ে সেই অধ্যবসায়ও ভূতনাথের নাই বলিলে অযথা বেশী বলা না।

......তাই ষোলো-সতর বৎসর পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে তানানানা করিয়া কাটাইয়া সর্ব্বাপেক্ষা সহজ বিদ্যা আয়ুর্ব্বেদ আয়ত্ত করিতে বদ্ধপরিকর সে নিশ্চয়ই হয় নাই—সম্মত হইয়াছে।......

শুভস্য শীঘ্রম্—

সেই দিনই কাঠের সিন্ধুক খুলিয়া কৃষ্ণকান্ত কলাপ আর মুগ্ধবোধ বাহির করিয়া রৌদ্রে দিলেন।

ভূতনাথ বই দু'খানাকে চিনিত—

তাহাদিগকে উঠানের রৌদ্রে পিঁড়ির উপর স্থাপিত দেখিয়া সে আর যাহাই হউক খুসী হইল না।—

……বই দু'খানির দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া ভূতনাথ ফস্ করিয়া যে কথাটি বলিয়া ফেলিল, তার মান কেহ রাখিল না।……

কথাটা কানে যাইবার পর কৃষ্ণকান্ত বক্রদৃষ্টিতে একবার ভূতনাথের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন—

ভূতনাথ সরিয়া গেলেই গৃহিণীকে গল্পটা শুনাইয়া দিবেন।……

এবং সে অবসর তখনই মিলিল।……

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন,—তোমার ছেলের বুদ্ধি শেষ পর্য্যন্ত বলদ দিয়ে টানাতে হবে দেখ্‌ছি—ঠিক্ সেই রকম।—বলিয়া গম্ভীর হইয়া গেলেন।

মাতঙ্গিনী বলিলেন,—কি রকম ?

—এক ছোঁড়াকে পাঠিয়েছে—

—কে ?

—কোনো গেরস্ত। একটা গল্প বল্‌ছি। পাঠিয়েছে দোকানে এক পয়সার বাতাসা আন্‌তে। দোকানী দিলে; ছোঁড়া গুণে বল্‌লে,—মোটে পাঁচখানা ?—দোকানী ক্ষেপে' উঠে' বল্‌লে—পাঁচখানা নয় ত' কি পঁচিশখানা দেবে ? ঘিয়ের দর জানিস্ আজকাল ?… ছোঁড়া লজ্জা পেয়ে চলে' এল।……বাড়ীতে বল্‌লে,—কিরে, মোটে পাঁচখানা বাতাসা এনেছিস্ এক পয়সায় ? ছোঁড়া বল্‌লে,—তাই দিলে, মা। বল্‌লুম, তা' দোকানী তেড়ে' উঠ্‌ল'; বল্‌লে,—ঘিয়ের দর জানিস্ আজকাল ?…শুনে গিন্নির হাত গালে উঠে' গেল; অবাক্ হ'য়ে বল্‌লেন,—কি বজ্জাত্ দোকানী গো! ঘিয়ের দর বেড়েছে তাতে বাতাসার কি!… বলিয়া তুমুল শব্দে খানিকটা হাসিয়া লইয়া কৃষ্ণকান্ত বলিলেন,—তোমার ভূতোর বুদ্ধি সেই ছোঁড়ার মত, কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ-জ্ঞান একেবারে নেই।

কিন্তু মাতঙ্গিনী হাসিতে পারিলেন না—

পুত্রের অজ্ঞানতার উদ্দেশ্যে স্বামীর এই বিদ্রূপে বিমর্ষ হইয়া কহিলেন, - কি, করেছে কি ?

—বল্‌ছে, পড়্‌ব কব্‌রেজী, তাতে ব্যাকরণের কি দরকার ?

কৃষ্ণকান্ত না হাসিয়া বলিলেন,—আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র খাঁটি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত…ব্যাকরণের পর সাহিত্য, কাব্য, অলঙ্কার, ন্যায় প্রভৃতি; তারপর শাস্ত্র—

ভূতনাথ মনে মনে বলিল,—কচু।

কৃষ্ণকান্ত অন্তর্যামী নন্—ভূতনাথের কচুর কথাটা টেরও পাইলেন না; বলিতে লাগিলেন, —কাজেই সংস্কৃত হৃদয়ঙ্গম করতে হ'লে ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি হওয়া আগে দরকার। ইত্যাদি।

দরকারী কথার কত ভাগের কত ভাগ তার কানে গেল তাহা ভূতনাথ নিজেই জানিতে পারিল না।—ঘাড় গুঁজিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, কৃষ্ণকান্তের মুখের শব্দ বন্ধ হইতেই সেদিক্‌কার কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে মনে করিয়া সে আপন কাজে গেল।··· ..

কিন্তু ভূতনাথ মাঝে মাঝে মায়ের কাছে নালিশ করে,—এ-গাছের পাতা, ও-গাছের মুল, এ-টার ছাল, ও-টার কুঁড়ি, এই নিয়ে ত' কবরেজের কারবার; তা' করতে মুগ্ধবোধ পড়ে' কি হবে?—বলিতে বলিতে অত্যন্ত মানসিক শ্রান্তির লক্ষণগুলি তার সর্বশরীরে প্রকাশ পায়।

মাতঙ্গিনী বলেন,—আমি ত' কিছু জানিনে রে।······

যাহা হউক্, শাস্ত্রাধ্যয়নের উপক্রমণিকা অনাসক্ত গয়ংগচ্ছভাবে চলিতে লাগিল;—এবং পবিত্র শাস্ত্রসৌধের প্রথম সোপানে দাঁড়াইয়া সে জীবনের এমন একটা দরকারী কাজ শেষ করিয়া আনিল যাহার ফল প্রতিফল দুটোই নিরেট।···· দুস্তর কলাপের প্রস্তর চর্ব্বণের চাইতে তা' ঢের সংক্ষিপ্ত ও সরস,—

উদ্দেশ্যও উচ্চদরের—

শুধু সনাতন শাস্ত্রীয় প্রথায় নরকনিবারক পুত্রলাভ।···ভূতনাথ বিবাহ করিল; তখন তাহার বয়স সতর' বৎসর কয়েকমাস মাত্র···

স্ত্রী মণিমালিকা ন' বছরের—

পণ সর্ব্বসাকুল্যে সাতশত টাকা মাত্র।

কলাপের সঙ্গে পাত্রের নিষ্ঠাহীন আলাপচারীতে পরের ঘরের অতগুলি টাকা আদায় হয় না······

বিবাহের পূর্ব্বে কৃষ্ণকান্ত কিঞ্চিৎ বিষয়বুদ্ধির আশ্রয় লইলেন······বৈবাহিক মহলে প্রচার করিয়া দিলেন, ভূতনাথ কলিকাতার বিখ্যাত প্রবীণ কবিরাজ শ্রীগোলককৃষ্ণ দত্তগুপ্ত মহাশয়ের প্রিয়তম ছাত্র······ব্যাকরণ ও সাহিত্য প্রভৃতি সমাপ্ত করিয়া মূলশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছে।······আরো বলিলেন,—দু'তিনটি পাশকরা ছেলের মূল্য এখন মাসিক বিশ বাইশ টাকার অধিক নয়; আয়ুর্ব্বেদের দিকে দেশের নাড়ীর টান যথার্থই ফিরিয়াছে; সুতরাং পশার দাঁড়াইয়া যাইতে বিলম্ব হইবে না; দু'তিন বছরেই—ইত্যাদি।······

তাই সাতশত টাকা পণ।

কৃষ্ণকান্ত নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ভূতনাথকে দিয়া ঔষধ প্রস্তুত করান—তৈল, ঘৃত, রসায়ন, অরিষ্ট, আসব,……বিবিধ রোগাধিকারের শাস্ত্রোক্ত বিবিধ ঔষধ। কৃষ্ণকান্ত কাছে-কিনারায় যখন রোগী দেখিতে যান তখন ভূতনাথকে সঙ্গে লইয়া যান।……পথে আসিতে আসিতে বুঝাইয়া দেন -রোগলক্ষণ : কোন্ রসাধিক্য কোন্ রোগের হেতু, কি ভাবে তার বিস্তৃতি ও নিবৃত্তি।……পিত্ত শ্লেষ্মা বায়ুর কোন্‌টা কুপিত হইয়া এই রোগীর রোগ কি ভাবে জটিল করিয়া তুলিয়াছে।……এমনি সব ভূয়োদর্শনের কথা।—

ভূতনাথ গাছ গাছ্‌ড়া ফল মূল কিছু-কিছু চিনিয়াছে; তাহাদের গুণাবলী ও প্রয়োগ বৈচিত্র্যের সঙ্গেও কিছু কিছু পরিচয় ঘটিতেছে।……

মণি ছোট্টটি—

স্বামীর সঙ্গে তার ভাব হইয়াছে।

ভূতনাথ মণিকে রাগায়, কাঁদায়, আবার খিল্ খিল্ করিয়া হাসায়ও।……মাঝে মাঝে মণি যখন বাপের বাড়ীর কথা ভাবিয়া মুখ ভার করিয়া থাকে তখন তাহাকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া সদুপদেশও দেয় ; বলে,—এই তোমার আপন বাড়ী—

কিন্তু অবুঝ মণি হঠাৎ অতটা উদার হইয়া উঠিতে পারে না ;—বলে,—ধেৎ। এ ত' তোমাদের বাড়ী। আমাদের বাড়ী

ভূতনাথ বলে—তা' বটে। কিন্তু তুমি যখন বড় হবে তখন বুঝ্‌বে, সে-বাড়ী তোমার দাদা বৌদির, এই বাড়ীই তোমার ; তারপর ছেলেপিলে হ'লে—

মণি এবার লজ্জা পাইয়া হাসে……

বলে,—ধেৎ।

মণির দু'বারকার দু'টি ভর্ৎসনায় কত তফাৎ ভূতনাথ তা' বোঝে—

খুসী হইয়া উঠিয়া যায়।

ভূতনাথের ছোট ভাই দেবনাথ ঘরে ঢুকিয়া বলে,—তুমি বৌদি না ছাই। বলিয়া বুড়ো আঙ্গুল দেখায়।

মণি কথা কহে না।

দেবনাথ বলে,—বললুম, দু'টো আম ছাড়াও, নুন লঙ্কা মেখে খাই ; তখন কথাই কওয়া হ'ল না। এখন দাদার সঙ্গে দেখা হয়েছে আর সোয়াগের হাসি হ'চ্ছে। এই বয়সেই শিখেছ ঢের !……

মণির কিন্তু মনেও আসে না যে,এই বয়সে দেবনাথও শিখিয়াছে ঢের !

—বেশ, বেশ, চলো দিচ্ছিগে। বলিয়া মণি লাফাইয়া ওঠে।

মণির জ্বর হইল—

উজ্জ্বল মণি ম্লান হইয়া গেল।······

কৃষ্ণকান্ত নাড়ী দেখিয়া বড়ি দিলেন; তাহাতে জ্বর ছাড়িল বটে, কিন্তু প্রাণরক্ষা হইল না······

শেষরাত্রি হইতে হঠাৎ ভেদ আরম্ভ হইয়া বেলা দু'টার সময় মণির নাড়ী ছাড়িয়া গেল।······সাঁখিভরা সিঁদুর লইয়া, লালপেড়ে সাড়ী পরিয়া, আল্‌তায় পা রঞ্জিত করিয়া খেলার পুতুল একরত্তি মণি কাঠের আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল।—

মাতঙ্গিনী চোখের জল মুছিয়া স্বামীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন,—হ্যাঁ গা, এক ফোঁটা ওষুধও ত' দিলে না······

কৃষ্ণকান্ত বড় বিজ্ঞ; তাই গৃহিণীর দিকে চাহিয়া ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিলেন,—দিলেও ফল হ'ত না, বুঝেই দিইনি। যম যে ব্যাধি পাঠায় তাকে আমরা দেখেই চিনি।—

আয়ুর্ব্বেদের এই চরম দিব্যদৃষ্টির বিষয় মাতঙ্গিনী কৃষ্ণকান্তের এত দিনের স্ত্রী হইয়াও বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না।······চোখে আঁচল দিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

মণির স্মৃতি মুছিবার নয়······

এখনো যেন সে মাটিতে আঁচল লুটাইয়া উঠানময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে······

'মা মা' বলিয়া আপন পেটের মেয়েটির মত অনুক্ষণ সে পায় পায় ঘুরিত।······সে যে ছেলেমানুষ ইহা কেমন করিয়া ভুলিয়া যাইয়া তিনি মণির কাজের ভুল ধরিয়া ধমক দিতেন!······ মণির মুখখানি বিষণ্ণ হইয়া উঠিত······এই ম্লান এই উজ্জ্বল······পরক্ষণেই সে 'মা' বলিয়া ঘেসিয়া আসিত······

মাতঙ্গিনীর বুক ফাট্‌ ফাট্‌ করে।—

ভূতনাথও কাঁদিল বিস্তর; কলাপ কিছুদিন রোগীর প্রলাপের মত অসহ্য হইয়া রহিল।······

সংসারে শোকতাপ আছেই—

আবার "ভগবদেচ্ছায়" মানুষ শোকতাপ ভুলিতেও পারে।······দিন দিন দূরত্ব বাড়িতে বাড়িতে মণির শোক কৃষ্ণকান্তের "ভগবদেচ্ছায়" গৃহ হইতে একেবারে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।······

ভূতনাথ পুনরায় কলাপে মন দিল।—

কৃষ্ণকান্ত ভূতনাথের পুনরায় বিবাহ দিলেন। বলিলেন,—স্বয়ং শিব দু'বার বিবাহ করিয়াছিলেন।...... কিন্তু অশৌচমুক্তির পর অষ্টাহের মধ্যে শিবের পাত্রী স্থির হইয়া গিয়াছিল কি না তাহা তিনি উল্লেখ করিলেন না।—

এবার পণ, পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা...... কিছু লোকসান গেল।

মণি মরিয়া পাত্রহিসাবে ভূতনাথের জীবনে খাদ মিশাইয়া দিয়া গেছে; বৈবাহিক মূল্যের কিছু লাঘব হইয়াছে, তাই কৃষ্ণকান্তের দুইশত টাকা—

কিন্তু বৌটি এবার আরো ভাল......

চমৎকার একটা সুহসিত প্রসন্ন লক্ষ্মীশ্রী অনুপমার মুখপদ্মে বিরাজ করিতেছে—

যেন "বালার্কসিন্দুরশোভিত" উষা,......সেইদিকে চাহিয়া মাতঙ্গিনীর চোখের পলক পড়িতে চাহে না......অনুপমা শ্বশ্রূর দৃষ্টির অর্থ বুঝিয়া মুখ ফিরাইয়া হাসে।—

মাতঙ্গিনী ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া বধূর মুখের উপর একবার করিয়া চোখ বুলাইয়া লইয়া যান......যেন তাঁর চতুর্দ্দিকেই খর রৌদ্র...... তার ঝাঁঝে চক্ষু পীড়িত হইয়া ওঠে......তাই বধূর রূপের শীতাঞ্জন তিনি বারম্বার চোখে মাখাইয়া লইয়া যান।

কিন্তু অদৃষ্টে তাঁর দুঃখ লেখা ছিল—

তাই একদিন আহ্লাদে গদগদ হইয়া মাতঙ্গিনী মনের কথাটাই বধূকে বলিতে গেলেন; কিন্তু কথাটা সুস্পষ্ট না হওয়ায় ফল উল্টা দাঁড়াইয়া গেল।......

বৌমার খাসকামরায় যাইয়া মাতঙ্গিনী হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—বৌমা, তোমার আর বাপের বাড়ী যাওয়া হবে না বাপু।

—অর্থাৎ তোমার ঐ মুখখানিকে আর চোখের আড়াল করছিনে......

কিন্তু বৌমা অন্তর্যামিনী নয়।—

শাশুড়ীর অভিলাষ শুনিয়া অনুপমা তার অনুপম চক্ষু দু'টি তুলিয়া সোজা মাতঙ্গিনীর দিকে চাহিল, এবং মাতঙ্গিনীর আশা-আকাঙ্খা-আহ্লাদ ঘূর্ণী বায়ুর মত আবর্ত্তিত হইতে হইতে কোথায় যে মিলাইয়া গেল তার চিহ্নও রহিল না।......সে দৃষ্টির অর্থ যে কি......প্রাণভরা কিন্তু অপ্রকাশিত আশার পরেই এ যে কত কঠিন নিরাশ্বাস......উগ্র মনের কতখানি উত্তাপ যে ঐ মুখখানির স্নিগ্ধ আবরণ ছাপাইয়া নিষ্পলক দৃষ্টির পথ ধরিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে......তাহা শুধু অনুভব করে মানুষের অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ প্রাণপুত্তলী।—

মাতঙ্গিনীর প্রাণ বধূর সেই দৃষ্টির অগ্নিবর্ষণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল……

মাতঙ্গিনী সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিলেন,—কিছু মনে করো না, মা ; তোমার মুখখানি—

কথা কয়টি উচ্চারিত হইয়াই অশ্রু-বেদনায় তাঁর কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইয়া গেল।

একান্ত আপনার জ্ঞানে নূতন বধূর প্রতি এই তাঁর প্রথম অসঙ্কোচ মুক্তপ্রাণ সম্ভাষণ।

বুকভরা সোহাগের আরো কত কথা বলিবার ছিল---

পাষাণী তাহা বলিতে দিল না।

মাতঙ্গিনীর মনে হইল, আশাভঙ্গের এই ব্যথাটা তিনি জন্মান্তরেও ভুলিতে পারিবেন না। ……কিন্তু ভুলিলেন ; এবং ভুলিতে তাঁহাকে জন্মান্তরে পৌঁছিতে হইল না।……দিন তিনেকের মধ্যেই তাঁহার মাতৃহৃদয় অজ্ঞান সন্তানের সুকঠিন অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তাহাকে পুনরায় তার উদার অঙ্গনে বরণ করিয়া লইল।—

ভূতনাথ কলাপ সমাধা করিয়া এখন মুগ্ধবোধ আরম্ভ করিয়াছে।……পিত্ত বায়ু কফ—ইহাদের কোন্‌টার প্রাবল্য কোন্ নাড়ীতে প্রকট হয় পিতার উপদেশে তাহাও যেন সে অল্প অল্প হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে।—

কিন্তু অনুপমা নাক সিট্‌কায়—

বলে,—কব্‌রেজী পড়ে' কি হবে শুনি ?

ভূতনাথ বলে—কব্‌রেজী ত' আজকাল বেশ মানের কাজ হয়েছে। পয়সাও—

—তা' জানি। ক'ল্‌কেতায় গিয়ে বস্‌তে' পার্‌বে ?

ভূতনাথ যেন অপ্রস্তুতে পড়ে ; বলে—দেশেও ত' বেশ পয়সা আছে।

—আমাদের সেই বনমালী কব্‌রেজের মত কব্‌রেজ হবে ত ? তার ত নেংটি ঘোচে না। আমরা তাকে বলি বোক্‌রেজ মশায়।—বলিয়া অনুপমা খিল খিল্ করিয়া হাসে।

ভুতনাথ মর্ম্মাহত হয়—

কবিরাজীকে সে নিজেও বড় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে না ; জঙ্গল কাটা আর শুক্‌নো কাঁচা জঞ্জাল জড়ো করা কবিরাজী যে হালফ্যাসনের খুব বড় একটা গর্ব্বের জিনিষ ইহাও সে মনে করে না ; তবু কবিরাজই সে হইবে …..অদৃষ্টের লিখন তাই—

তাই নিজের স্ত্রীর মুখে সেই কবিরাজীর প্রতিই অপার অবজ্ঞার কথা শুনিয়া সে সত্যকার ক্লেশই পায়।

কিন্তু অনুপমা মণি নয়—

অনুপমাকে ধমক্ দিলে ধমকের প্রতিধ্বনি যাহা সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া আসিবে তাহা মূলধ্বনিকে বহু নিম্নে রাখিয়াই আসিবে তাহা সে বেশ জানে।……

অনুপমা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া থাকে; ভূতনাথ চলিয়া আসিতে পা তোলে।…অনুপমা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে,—তোমার নাম রেখেছিল কে?

—বাবা রেখেছিলেন।

—নামের মানে ত মহাদেব, নয়? বলিয়া অনুপমা হাসিয়া আকুল হইয়া যায়।……

সম্মুখে হাসির মুক্তধারা—

উদ্ভিন্ন নিটোল যৌবন—

মুক্তামালার মত দন্তপাঁতি—

আরক্ত গণ্ডতট—

ফুল্ল অধরপুট……

কিন্তু ভূতনাথ ঘামিয়া অস্থির হইয়া ওঠে।……

ঠিক সে ধরিতে পারে না, কিন্তু তাহার মনের দুয়ারে কেমন একটা দুঃসংবাদ আসিয়া পৌঁছায়……অন্তরের অতি সুকোমল স্থানে সুতীক্ষ্ণ কাঁটার মত একটা ব্যথা ফোটে……কাহার প্রচ্ছন্ন কান্নার নিষ্ঠুর একটা কালো ছায়া বুক জুড়িয়া পড়ে……চারিদিক অশ্রু-কলঙ্কে মলিন হইয়া ওঠে……

ভূতনাথ উঠিয়া পড়ে; ধরা গলায় বলে,—আসি এখন।

অনুপমা বলে,—দণ্ডচূর্ণ পাকে চড়িয়ে এসেছ বুঝি? তা' এস।

মাতঙ্গিনী ছেলের কাতর মুখ দেখেন—

তাঁর সর্ব্বজ্ঞ মাতৃহৃদয়ের কাছে ভিতরের অনন্ত দুঃখের বার্ত্তাটি ষোলো আনাই আসে……

মনটি তাঁর লুটাইয়া লুটাইয়া ভগবানের পা ধরিতে ছোটে……

কৃষ্ণকান্ত একদিন প্রকাণ্ড এক টাকার তোড়া সিন্ধুকে তুলিয়া মাতঙ্গিনীকে ডাকিয়া বলিলেন,—বৌমাকে বিশেষ যত্ন-আত্তি করো। ওঁর লক্ষ্মীর অংশ প্রবল।

মাতঙ্গিনী টাকার তোড়াটা দেখেন নাই; হঠাৎ কথাটা বুঝিতে না পারিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন,—এবার পাটে দু'হাজার টাকা মুনোফা হয়েছে।……তাঁর তখনকার তৃপ্তিটুকু উপভোগের জিনিষ।—

দেবনাথ সেখানে উপস্থিত ছিল; মাতঙ্গিনী কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সে বলিয়া উঠিল,—মণি-বৌই ছিল ভাল; এ একটা কি এনেছ দাদাকে বিয়ে দিয়ে! ভুরু তুলেই আছে! দেমা—

কৃষ্ণকান্তের হাতের এক চড় খাইয়া দেবনাথের অনধিকার চর্চ্চা বন্ধ হইয়া গেল।

পুত্রবধূতে লক্ষ্মীর অংশ প্রবল হইলেও কৃষ্ণকান্তের মুনাফার টাকা পর বৎসরই ঐ পাটের টানেই বাহির হইয়া গেল।……

অনুপমার জ্বর হইয়াছে—

জ্বর অল্পই……

কিন্তু অনুপমা লাথি ছুড়িয়া, কিল ছুড়িয়া, কাঁদিয়া, বায়না লইয়া, বাটী আছড়াইয়া, ঔষধ পথ্য ফেলিয়া দিয়া এমন কাণ্ড বাধাইয়া তুলিল যেন লজ্জা-সরম আর সহিষ্ণুতা বলিয়া সংসারে কোন জিনিষই নাই।……তাহার কাছে ধমক্ না খাইল এমন লোক নাই……মাতঙ্গিনী পথ্য দিতে আসিয়া অকথ্য অপমানিত হইয়া গেলেন……ভূতনাথ চড় খাইতে খাইতে বাঁচিয়া গেল……দেবনাথের দিকে ত সে পা-ই তুলিল।—

যাহা হউক, বহু তাণ্ডব কাণ্ড দেখাইয়া জ্বর ছাড়িয়াছে; অনুপমা অন্নপথ্য করিয়াছে; কিন্তু সেইদিনই ভোররাত্রে ভেদ আরম্ভ হইয়া বিকাল নাগাদ্ তার ধাত্ বসিয়া গেল।……অনুপমা মণিমালিকার অনুগমন করিল।

মণি মরিয়াছিল, বৈশাখের কাঁচা আম খাইয়া; অনুপমা মরিল, অজীর্ণরোগের উপর জিদ্‌বশে অতিরিক্ত গুরুপাক দ্রব্য উদরস্থ করিয়া।……মাতঙ্গিনী কাঁদিলেন, ভূতনাথ কাঁদিল, দেবনাথও কাঁদিল; কৃষ্ণকান্ত প্রতিবেশিগণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বারম্বার চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া শোক-চিহ্ন গোপন করিতে লাগিলেন; বলিলেন,—বড় জেদী একগুঁয়ে মেয়ে ছিল, ভাই……

ভূতনাথ নূতনতর একটা আঘাত পাইল, মণির মৃত্যুতে যাহা সে পায় নাই।

মণি তার যৌবনের সহচরী হইয়া উঠে নাই……সে ছিল খেলার সামগ্রী, স্নেহের জিনিষ, মিষ্ট দৌরাত্ম্যের পাত্রী।—

অনুপমার নিরুপম রূপ-দীপালির চতুর্দ্দিকে যৌবনের যে রাস-আয়োজন দিন দিন অপর্য্যাপ্ত নিবিড় হইয়া উঠিতেছিল, তাহারই আবেদন তাহার বুকে রক্তে দুর্ণিবার জাগরণ আনিয়া দিয়া গেছে।……অনুপমার সমস্ত অকারণ নির্ম্মমতা অতৃপ্ত তৃষ্ণার খরতাপে বাষ্প হইয়া দেখিতে দেখিতে ভূতনাথের মনোরাজ্য হইতে অদৃশ্য হইয়া যাইত……চক্ষুর সম্মুখে জ্বলিতে

থাকিত তার দেহখানা—ইন্দ্রজালের আলোকোৎসবের মত রূপ, আর চির-বিলসিত বসন্তের কুসুমোৎসবের মত যৌবন······তাহাদের অভাবে ভূতনাথের ভূত ভবিষ্যত আর বর্ত্তমানের দিগন্ত পর্য্যন্ত একেবারে রুক্ষ শুষ্ক কর্কশ হইয়া গেছে।······

ভূতনাথের কলাপ মুগ্ধবোধ এবং পরবর্ত্তী অন্যান্য গ্রন্থ তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া আল্‌মারীতে যাইয়া উঠিয়াছে।······এখন সে পূরাপূরি একজন কবিরাজ।—

কিন্তু বিবাহে তার আর ইচ্ছা নাই।—

কৃষ্ণকান্ত পুত্রের আচরণে দিন দিন অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছেন ; এই ভাবে আর কিছুদিন চলিলেই সংসারের উপর তাঁহার আর কিছুমাত্র মার্জ্জনার ভাব থাকিবে না -এ ভয়ও তিনি স্পষ্টই দেখাইয়া বেড়াইতেছেন।······

... স্ত্রীই হইয়াছে আজকালকার লোকের যেন মহাগুরুর সেরা : একটির নিপাতেই সে-সম্পর্কে আর কাহাকেও যেন গ্রহণ করা যাইতে পারে না।······

আগেকারটা ?—সেটা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়।

···চলাচলম্ ইদং সর্ব্বম—মরিবে ত' সবাই, দু'দিন আগে দু'দিন পরে।······মূর্খ আর বলে কাকে !······স্ত্রী মারা গেলে তার ধ্যানেই যাবজ্জীবন কাটাইয়া দিতে হইবে—ইহা কোন্ শাস্ত্রের কথা !······এই সৌখীন সন্ন্যাসের ভাণ আধুনিকতার ফল, যেমন ব্যাপক্ তেম্‌নি অসহ্য। ······মানুষ মরে বলিয়াই ত' পৃথিবীতে মানুষের স্থান হয় ; নতুবা এতদিন মানুষকে দলে দলে যাইয়া সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইত !······

কিন্তু ভূতনাথ একেবারে নিঃস্পৃহ।

ধিক্কারে, ভর্ৎসনায়, অভিযোগে, অনুযোগে, দোহাইয়ে, অনুজ্ঞায়, অনুনয়ে কৃষ্ণকান্ত ভূতনাথকে ঘন ঘন নাস্তানাবুদ করিয়া ছাড়িয়া দিতে লাগিলেন।—

প্রত্যুত্তরে ভূতনাথ বলে,—বাবা, আমায় মার্জ্জনা করুন ; বিবাহে আর আমার রুচি নেই ; বরং দেবনাথকে ধরুন ; সেই সকল বিষয়ে আপনাদের সাধ পূর্ণ করবে।······

কৃষ্ণকান্তকে এ-সব কথা বলা বাহুল্য ; কাহার দ্বারা তাঁহাদের সাধ আশা পূর্ণ হইবে তাহা তিনি পরিষ্কার জানেন।······তবে কথা এই যে, ভূতনাথকে ছাড়িয়া দিয়া দেবনাথকে ধরিতে তাঁর আপাততঃ তেমন আগ্রহ নাই—নানা কারণে।······দেবনাথের বিবাহের পরই ভূতনাথের বিবাহোত্তম এ-ক্ষেত্রে সূক্ষ্মতঃ দৃষ্টিকটু না হইলেও, ভূতনাথই অবশেষে আপত্তির এই অতিরিক্ত কারণটা দেখাইয়া যখন তখন বিরুদ্ধ দিকে জোর করিতে পারিবে।······

তারপর, এই কারণেই, পাত্রের বয়স খুবই অল্প হইলেও, কন্যার দিক হইতে বয়স সম্বন্ধেই

সন্দেহের একটা কথা উঠিতে পারে। দুইটি স্ত্রী মারা গিয়াছে, তারপর কনিষ্ঠের বিবাহ হইয়া গেছে, তারপর জ্যেষ্ঠের জন্য এই উদ্যোগ...... বয়স বেশী না হইয়াই যায় না ; এই সূত্র ধরিয়া পণকে আরো খাটো করিবার জন্য একটা টানাটানি চলিতে পারিবে।......

সুতরাং কৃষ্ণকান্ত প্রকাশ্যে বলিলেন,—জ্যেষ্ঠ অকৃতদার অর্থাৎ বিপত্নীক অবস্থায় থাক্‌তে কনিষ্ঠের বিবাহসংস্কার শাস্ত্র এবং লোকাচার দুইয়েরই বিরোধী প্রচণ্ড অকল্যাণকর একটা ব্যাপার।—

তারপর বলিলেন,—এ ত' নির্ব্বোধেও জানে।

দ্বিতীয়তঃ, ভূতনাথের গর্ভধারিণীর স্বাস্থ্য আজকাল ক্রমশঃই যেরূপ দ্রুতবেগে খারাপের দিকে যাইতেছে, তাহাতে তাঁহাকে এই বেলা একটা সহকারী না দিলে তাঁর মৃত্যু ঘটিতেও পারে।......

তৃতীয়তঃ, শ্মশানবৈরাগ্য যৌবনের অপরিহার্য্য একটা ধর্ম্ম হইলেও, সেইটাকেই জীবনে স্থায়ী করিয়া লইয়া প্রাণপণে তাহাকে পালন করিয়া যাইতে হইবে এ-ব্যবস্থা গো-মুখেও দিবে না।......

চতুর্থতঃ—যাক্‌, উহারাই কি যথেষ্ট নহে ?—

মাতঙ্গিনী কিছু বলেন না।

যম তাঁহাকে দু' দু'বার দাগা দিয়াছে—

তাঁর বধূ-জীবন আর মাতৃ-জীবনের চির-লালিত আকাঙ্খাটি সেই নিষ্ঠুর উপ্‌ড়াইয়া লইয়া পায়ে দলিয়া দিয়াছে...সেই বিবর্ণ অকালে হৃদয়চ্যুত প্রিয়তম বস্তুটির দিকে চাহিয়া তাঁহার বুক কাঁপে।...নিজের ক্লেশ ভুলিয়া তিনি পুত্রের কথাই ভাবেন...সে বুঝি অসুখী হইবে।......

সেদিকে নিস্তার পাইয়াও ভূতনাথ পিতৃদেবের অবিশ্রান্ত তাড়নায় মরিয়া হইয়াই একদিন বলিয়া দিল,—যা' ইচ্ছে করুন......

বলিয়া সে বোধ হয় কাঁদিতেই উঠিয়া গেল।

উল্লাসের বিস্তৃত হাসিতে কৃষ্ণকান্তের মুখমণ্ডল ভরিয়া উঠিল।—

পণ ও পাত্রী ঠিকই ছিল—

দু' দশদিন অগ্রপশ্চাৎ কৃষ্ণকান্ত দু'টিকেই ঘরে তুলিলেন।......

পণ আটশত টাকা।

ভূতনাথের বৈবাহিক জীবনে আরো খানিকটা খাদ মিশিলেও, পাত্রীর রং ময়লা বলিয়া খাদের কথা ও-পক্ষকে কৃষ্ণকান্ত বিন্দুমাত্রও তুলিতে দিলেন না।—

বীণাপাণির রং সুবিধার নয়, কালোই। সুবিধার মধ্যে তার চক্ষু দু'টি আর ভ্রূযুগল; ভুরু দু'টি টানা টানা; চক্ষু দু'টি আবেশে ভরা।—

মাতঙ্গিনীর নিজের সুখ দুঃখ কোনোদিনই তাঁর অন্তরের একান্ত নিজস্ব জিনিষ হইয়া উঠিতে পারে নাই,...জলের উপর পদ্মপত্র যেমন ভাসে তেম্‌নি করিয়া মাতঙ্গিনীর সর্ব্বান্তঃকরণ সংসার-পাথারের বুকের উপর ভাসিয়া বেড়ায়...পাথারে ঘা লাগিলেই তাঁর বুক দুলিয়া উঠে।—

মাতঙ্গিনী চোখে জল আসিতে দিলেন না—

স্বামী তৃপ্ত হইবেন,

পুত্র প্রীত হইবে,

অম্লানবদনে তাই তিনি বীণাপাণিকে তেম্‌নি সোহাগে বরণ করিয়া লইলেন; এবং তাঁহারই হৃদয়ের গাঢ় রসে নববধূ নূতন ভূমিতে পল্লবিত হইয়া উঠিতে লাগিল।......

কৃষ্ণকান্ত বলেন,—বৌ কেমন হয়েছে গো?

মাতঙ্গিনী বলেন,—লক্ষ্মীটি।

কৃষ্ণকান্তের মনে পড়ে—বিগত দু'টির সম্পর্কেও মাতঙ্গিনী ধনধান্যদায়িনী ঐ দেবীটিরই নামোল্লেখ করিয়াছিলেন।...একটা গল্প তাঁর মনে পড়িয়া যায়—

কোথাকার এক তাঁতি......

কিন্তু গল্পটি তাঁর বলা হয় না......মাতঙ্গিনীর দীর্ঘনিঃশ্বাসের ছোট্ট একটি অস্ফুট শব্দ তাঁর কানে আসে।—

দেবনাথ বলে,—এই বৌদিই আসল বৌদি। আগের দুটো ভালো ছিল না।...একটু থামিয়া আবার বলে,—প্রথমটা ছিল নেহাৎ ছোট, গরজ বুঝত না। তারপরেরটা ছিল বদ্‌-মেজাজী। এইটে বেশ......

মাতঙ্গিনীর প্রাণ ছাঁৎ করিয়া ওঠে; বলেন,—বেশ কিসে রে?

—কথায় বার্ত্তায় আলাপে আদরে বেশ।

শুনিয়া, প্রখর মধ্যাহ্নের উপর মেঘের চঞ্চল ছায়ার মত, মাতঙ্গিনীর বুকের ভিতর দিয়া কিসের একটা সুখকর সুশীতল মৃদুস্পর্শ ভাসিয়া যায়।...কিন্তু পরক্ষণেই তিনি চম্‌কিয়া ওঠেন। ...সারাজীবন ভরিয়া শুধু মানুষকে আপন করিয়া তুলিয়া তিনি দিনান্তের বহু পূর্ব্বেই তাহাকে বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছেন...তবু আপন করিয়া লইবার মহালোলুপতা তাঁর আজিও তেম্‌নি

জাগ্রত...মাতৃ-হৃদয়ের সে-ক্ষুধা যম হরণ করিতে পারে নাই।...প্রাণপণে সেই ক্ষুধাটিকে দমন করিবার চেষ্টা তাঁর আসিয়াছে।...কিন্তু এ যে কথায় বার্ত্তায় আলাপে আদরে বেশ !—

ভূতনাথ মণিকে হাত ধরিয়া টানিয়া কাছে লইত—

তার ঘোমটা লইয়া কাড়াকাড়ি করিত—

কত খেলা, কত আমোদ, কত কৌতুক।......

অনুপমাকে সে লুকাইয়া দেখিত, হঠাৎ দেখা দিত; নিজেকে সহস্র চতুর অভাবনীয় উপায়ে তৃপ্ত করিবার লালসায় সে ছট্‌ফট্ করিয়া বেড়াইত।.....

কিন্তু বীণাপাণির কাছে সে আসে শান্ত হৃদয়ে...ঝড়ের পর ঢেউ আপ্‌নি থামিয়া স্রোতের অন্তর ব্যাপিয়া শুধু একটা নিঃশব্দ ক্ষিপ্রতা রহিয়াছে।...

বীণাপাণি জানে, স্বামী পূর্ব্বে দু'বার বিবাহ করিয়াছিলেন : স্ত্রী দু'টিই সুন্দরী ছিল।—

সে কালো।—

মাতঙ্গিনী দুরু দুরু বুকে ভাবেন, ছেলে অসুখী না হয়।

তাঁর মনের দুশ্চিন্তা মনেই পরিপাক পাইতে পাইতে সহসা এক সময় দুঃসহ হইয়া শুধু একটি প্রশ্নেই আত্মপ্রকাশ করিতে চায়।...বলেন,—সব জানো ত' বৌমা, আগেকার কথা ?

বীণাপাণির বুঝিতে কিছুই বাকি থাকে না। বলে,—জানি, মা।...তারপর মনে মনে বলে, আমি যে কালো।—

মাতঙ্গিনী তার মনের কথা কি করিয়া টের পান বীণাপাণি তা' জানে না; তার মুখচুম্বন করিয়া বলেন,—মা আমার কালো; কিন্তু কালোতেই কেমন মানিয়েছে।

এটা সান্ত্বনার কথা—

শ্বাশুড়ীর এই মমতার্দ্র ছলনায় বীণাপাণি একটু হাসে; হাত বাড়াইয়া শ্বশ্রূর পায়ের ধূলা লইয়া বলে,—তুমি ভেবো না, মা......

মাতঙ্গিনী অবাক্ হইয়া যান্—

তাঁর লুকাইত উদ্বেগ কি করিয়া বধূর কাছে ধরা পড়িল!......

আশীর্ব্বাদ করেন,—জন্ম এয়োতি হও।

মণি শ্বাশুড়ীর সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মত ঘুরিত—কতক ভয়ে, কতক কৌতুকে; মনের কথা সে বুঝিত না; কাজ পণ্ড করাই তার দস্তুর ছিল, দৈবাৎ উৎরাইয়া যাইত।...মাতঙ্গিনী বকিয়া ঝকিয়া

পরক্ষণেই তাহাকে কোলের ভিতর টানিয়া লইতেন।...মণিকে তিনি আপন পেটের অবোধ সন্তানের মত ভালবাসিয়াছিলেন।—

অনুপমা প্রকাশ্যে একবারে হাতে-কলমে পায়ে না ঠেলিলেও, আমল প্রায়ই দিত না। ...দরদ বোঝা আর বুঝিয়া দেখা তার বড় ছিল না।...তবু মাতঙ্গিনী তাহাকে ভালবাসিয়াছিলেন —পুত্রের প্রিয়তমা বলিয়া।...অলক্ষ্যে থাকিয়াই তিনি বুঝিতে পারিতেন, বধূকে পাইয়া পুত্র একহিসাবে চরিতার্থ হইয়াছে।—

কিন্তু বীণাপাণি একেবারে অন্যরকম—

অতিশয় শান্ত, অথচ এমন তীক্ষ্ণধী যে মাতঙ্গিনীর বিস্ময়ের অন্ত থাকে না—কি করিয়া অতটুকু মেয়ে তাঁর মনের সুদূরতম প্রান্ত পর্য্যন্ত একেবারে যেন স্পষ্ট দেখিতে পায়!---

মাতঙ্গিনী পরের হাতের সেবা কখনো পান নাই। সেবা কি মধুর সামগ্রী সে স্বাদ তিনি বীণাপাণির হাতে প্রথম পাইলেন।

অলক্ষ্যে থাকিয়াই মাতঙ্গিনীর সর্ব্বান্তঃকরণ অশেষ সুখের সঙ্গে অনুভব করে, পুত্রের মন বসিতেছে।...এ বসায় কলরব নাই, উদ্দামতা নাই, বিক্ষোভ নাই; জয়-পরাজয়ের শঙ্কার নিঃশ্বাসে তাহা উত্তপ্ত নহে...এ বসা শুধু একটা রসঘন নির্ম্মল মধুরতার মাঝে নিষ্কম্প শান্ত আত্মসমর্পণ।—

ভূতনাথের পসার হইয়াছে—

কিন্তু সব জিনিষেরই "মূল্যাদি" অত্যধিক বাড়িয়া যাওয়াই সংসারের 'নাই নাই' রবটা যেন থামিয়াও থামে না।...

মাঝে মাঝে কৃষ্ণকান্তের নামে মণিঅর্ডারে টাকা আসে; কে পাঠায়, কেন পাঠায় কে জানে; কৃষ্ণকান্ত সাবধানে লুকাইয়া টাকাটি গ্রহণ করেন।

কিন্তু হঠাৎ একদিন কিছুই লুকান রহিল না।......

দূরের এক রোগীর লোক আসিয়া কৃষ্ণকান্তকেই চাহিয়া বসিল—তাঁহার পরিবর্ত্তে তরুণ কবিরাজ ভূতনাথকে সে কিছুতেই মঞ্জুর করিল না...রোগ বড় কঠিন।—

কৃষ্ণকান্ত অতীব অনিচ্ছার সহিত পাল্কীতে যাইয়া উঠিলেন; এবং তাঁহার পাল্কীও দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল, মণিঅর্ডারও আসিয়া পড়িল।—

বীণাপাণির পিতা পাঠাইয়াছেন, দশটি টাকা—।

ভূতনাথের বুদ্ধি কলাপ অধ্যয়নকালেই স্থূল ছিল; কিন্তু আজকাল অন্ততঃ বহিরাবরণ

ছিন্ন করিবার মত ধারালো হইয়াছে।...টাকা দশটি পুরোভাগে রাখিয়া হুঁকায় দু'টি টান দিতেই সমগ্র ব্যাপারটি তাহার কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।...রঙের অপরাধে পুত্রবধূর পিতাকে মাসে মাসে জরিমানা দিতে হইতেছে।—

...এবং এই ব্যাপারের সুরুর সুদূর ইতিহাসটাও তার অজ্ঞাত রহিল না...অপরাজিতাটিকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি পুনরায় গোলাপ আহরণ করিয়া আনিবেন যদি—

ঐ এক কথাতেই বিষম ভয় পাইয়া কালো মেয়ের বাপ ছেলের বাপকে সংযত রাখিতেছেন।......

আরো একটা নিদারুণ অতি ভয়ঙ্কর সন্দেহ ধীরে ধীরে ভূতনাথের মনে স্থিতিলাভ করিতেছিল।......কি হেতু অবলম্বন করিয়া এই অসহ্য সন্দেহের উদ্ভব তাহা তাহার নিজের কাছেই একটা দুরূহ হেঁয়ালির মত; অথচ সন্দেহটা যে আদৌ অমূলক নয় এ বিশ্বাসও অনিবার্য্য, যেন নিজেই তৈরী হইয়া উঠিয়াছে।

কৃষ্ণকান্তের পাল্কী অনেক বেলায় উঠানে আসিয়া নামিল; এবং তিনি বিশ্রামের জন্য অন্দরে না যাইয়া হাঁসফাঁস্ করিতে করিতে বাহিরের ঘরে ঢুকিয়াই এমনভাবে থম্‌কিয়া গেলেন যেন চুরি করিতে আসিয়া অন্ধকারে একেবারে পাহারাওয়ালারই ঘাড়ে পড়িয়াছেন।—

ভূতনাথের কোলের কাছেই 'দশটি টাকা সাজান' রহিয়াছে, এবং তাহার শ্বশুরের নাম—সম্বলিত কুপনখানাও রহিয়াছে......তাহারাই এই মহৌষধির কাজ করিয়াছে।

ভূতনাথ টাকা দশটির দিকে চাহিয়া বলিল,—শ্বশুর আপনাকে দশটা টাকা পাঠিয়েছেন। কেন?

কৃষ্ণকান্ত সহসা প্রগল্‌ভ হইয়া উঠিলেন—তর্ তর্ করিয়া বলিয়া গেলেন,—তোমাকে বোধ হয় সাহায্য করেছেন। অতি অমায়িক সজ্জন তিনি। একখানা চিঠিতে একবার লিখেছিলাম তোমার কথা, যে শ্রীমানের বড় টানাটানি; তাই বুঝি তিনি মেয়ে জামাইকে—

বলিতে বলিতে কৃষ্ণকান্ত অমায়িক সজ্জন-প্রেরিত টাকা দশটি তুলিয়া লইয়া পুত্রের সম্মুখ হইতে পালাইয়া যেন বাঁচিলেন।

কিন্তু মানুষের দুষ্কৃতি অত সুলভে নিষ্কৃতি পায় না—

ভূতনাথের পিতৃভক্তি যেন পিতাকেই পদে পদে তেম্‌নি সবেগে অনুসরণ করিয়া নিঃশেষ হইয়া বাহির হইয়া গেল।......তাঁহার উচ্চারিত মিথ্যা কথাগুলির বিনাশ কিন্তু অত সহজে ঘটিল না......তাদের ধ্বনি, আর প্রতিধ্বনির পর প্রতিধ্বনি জাগিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া দুর্ভাগ্য ভূতনাথের কর্ণবিবরে আবর্ত্তিত হইতেই লাগিল।

ভূতনাথের শ্বশুর আর টাকা পাঠান না ; ভূতনাথ অভয় দিয়া নিষেধ করিয়া তাঁহার জ্ঞান-ফুটাইয়া দিয়াছে। সুযোগ পাইয়া অর্থাৎ জামাতাকে নিজের তরফে পাইয়া, বলরামবাবু কৃষ্ণকান্তকে স্পষ্টভাষায় ধাপ্পাবাজ, অর্থপিশাচ প্রভৃতি কুকথা না বলিলেও, পত্রে যাহা বলিয়াছেন তাহা, লাঠি উল্টাইয়া ধরিলে কোঁৎকার মত, ঐ একই জিনিষ।—

কৃষ্ণকান্ত পুত্রের সঙ্গে বাক্যালাপ একপ্রকার বন্ধ করিয়াই দিয়াছেন। জন্মদাতা পিতার অপেক্ষা কন্যাদাতা পিতা সম্পর্কে হইল বড়—আর তারই স্বার্থ হইল বড়!……অমন ছেলের—ইত্যাদি।…অসহ্য হইয়া সংস্কৃত এক শ্লোকই তিনি আওড়াইয়া দিলেন।

মূর্খ পুত্রের জন্মদাতার যত কষ্ট সব সেই শ্লোকের অক্ষরে অক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে।

বীণাপাণির জ্বর।

জ্বর অল্প ; কিন্তু তাহাতেই মাতঙ্গিনীর বুকের ভিতর পৃথিবীর দুশ্চিন্তা দাবাগ্নির দাহ লইয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে ;…… আকুলিব্যাকুলি কেবলি মধুসূদনকে ডাকিয়া ডাকিয়া উৎকণ্ঠায় উদ্বেগে তাঁর জিহ্বা শুকাইয়া অনড় কাঠ হইয়া গেছে।……

আর দুটি এম্‌নি করিয়াই মায়া কাটাইয়াছিল।

কিন্তু এবার মধুসূদন তাঁহার ডাকে বিচলিত হইয়া প্রাণরক্ষক দূত পাঠাইয়া দিলেন।

সন্ধ্যার পর বীণাপাণি একলাটি শুইয়া আছে ; মাতঙ্গিনী এতক্ষণ তাহাকে কোলের কাছে করিয়া বসিয়াছিলেন ; তাহাকে পথ্য দিয়া এই মাত্র উঠিয়া গেছেন।

—বৌমা, কেমন আছ ? বলিয়া কৃষ্ণকান্ত আসিয়া দাঁড়াইলেন।

বীণাপাণি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া বলিল,—ভালই আছি, বাবা।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন,—কিছু খেয়েছ ?

—খেয়েছি।

—কখন ?

—এখুনি খেলাম।

—তবে কিছুক্ষণ বাদে এই ওষুধটা খেয়ে ফেলো'।—বলিতে বলিতে কাপড়ের খুঁটের আড়াল হইতে খল বাহির করিলেন। বলিলেন,—জ্বর যদি আবার আসে তবে ছেলেমানুষ বড় কষ্ট পাবে ; আগে থেকেই সাবধান হওয়া ভালো। এই খাটের পায়ার কাছেই রইল কাগজ-ঢাকা ; নিজেই উঠে খেয়ে ফেলো'।

বীণাপাণি কহিল,—আচ্ছা।

ভূতনাথ কোথায় ছিল কে জানে—

কৃষ্ণকান্ত বাহির হইয়া যাইতেই সে শশব্যস্তে ঘরে ঢুকিয়া বলিল,—বাবা এসেছিলেন দেখ্‌লাম। তিনি কি ওষুধ দিয়ে গেলেন ?

বীণাপাণি বলিল,—হ্যাঁ। কেন ?

স্বামীর কণ্ঠস্বরের অর্থটা সে বুঝিতে পারিল না।

—খাওনি ত' ?

বীণাপাণি নিরতিশয় বিস্মিত হইয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিল।······এ ব্যাকুলতার অর্থ কি ?······বলিল,—না। কেন বল না ?

—কোথায় সে ওষুধ ?

—খাটের ঐ পায়ার কাছে ঢাকা রয়েছে দেখ।

ভূতনাথ ঔষধের খল লইয়া বাহির হইয়া গেল।

কৃষ্ণকান্ত কবিরাজ তাকিয়ায় ভর দিয়া অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় পরম তৃপ্তির সহিত চোখ বুজিয়া সট্‌কা টানিতেছিলেন—

কিন্তু এ-সুখ তাঁর অদৃষ্টে টিকিল না।······

মানুষের পায়ের শব্দে চোখ্ খুলিয়াই তিনি সামনে যেন ভূত দেখিলেন—এম্‌নি অপরিসীম ত্রাসে তাঁর সর্ব্বশরীর থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া মুখ দিয়া কেবল একটি অর্দ্ধোচ্চারিত স্বল্পজীবী আর্ত্তনাদ বাহির হইয়াই কণ্ঠ নিঃশব্দ হইয়া রহিল।······

ভূতনাথ সেদিকে দৃক্‌পাতও করিল না ; একটু হাসিয়া বলিল,—এ বৌটার পরমায়ু আছে, তাই কলেরায় মর্‌ল' না, বাবা।······পারেন ত' নিজেই খেয়ে ফেলুন।······বলিয়া সে ঔষধসমেত হাতের খল আড়ষ্ট কৃষ্ণকান্তের সম্মুখে নামাইয়া দিল।

তৃষিত আত্মা—

সীতাপতি মারা গেলেন বড় হঠাৎ।

খামার-বাড়ী হইতে বেলা অনুমান সাড়ে এগারটার সময় বাড়ী ফিরিয়া মণ্ডপ-ঘরে তক্তপোযের উপর বসিয়া যখন তিনি ভৃত্যকে তামাক দিতে বলিলেন তখনো তাঁর শরীরে বাহ্যিক কোনো গ্লানি ছিল না; কিন্তু তামাক সাজিয়া আনিতে যে অত্যল্প সময়টুকু লাগিল তাহারই মধ্যে দেহের কোথায় যে কি কাণ্ড ঘটিয়া গেল বোঝা গেল না। ভৃত্যের হাত হইতে হুঁকাটি লইয়াই প্রথমে তাঁর হাত, পরে সর্ব্বাঙ্গ থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। হস্তচ্যুত হইয়া হুঁকা পড়িয়া যায় দেখিয়া ভৃত্য তাড়াতাড়ি হুঁকাটি লইয়া লোক ডাকিতে ডাকিতে সীতাপতিকে ধরিয়া শুয়াইয়া দিল; সীতাপতি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। ইহার অল্পক্ষণ পরেই পুত্রপরিজন-পরিবেষ্টিত সীতাপতি স্বর্গারোহণ করিলেন।

যে বহুকাল রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া শয্যায় শুইয়া ক্রমে ক্রমে তিল তিল করিয়া ক্ষয় হইয়া প্রাণত্যাগ করে তাহার মৃত্যুতে তাহার অধিকৃত স্থানটিই কেবল শূন্য হইয়া যায়—সে যেন নিশ্চিত এবং নিঃশেষ অনুপস্থিতি; কিন্তু, যে-মানুষ এই ছিল এই নাই সে কাছে না থাকিয়াও কোথায় যেন থাকে; তার অভাবে গৃহের প্রত্যেক কক্ষ, প্রত্যেক অঙ্গন, প্রত্যেক দ্বার, প্রত্যেক মোড়, প্রত্যেক অংশ—গৃহের সমগ্র মর্ম্মস্থলটিই যেন শূন্য হইয়া হা হা করিতে থাকে; ঠিক সেই কারণেই আবার জীবিতের সচকিত ভীতির অন্ত থাকে না,—ঐ বুঝি সে আসনে বসিয়া, ঐ বুঝি সে দুয়ারে দাঁড়াইয়া, ঐ বুঝি তার কণ্ঠস্বর—এমনি ভুল সহস্রবার ঘটিয়া মনোরাজ্যের সীমা ছাড়াইয়া মৃতের দৈহিক অস্তিত্বের মৃণালটুকুর নিশ্চিহ্নরূপে ও নিঃশেষে নিক্রান্ত হইয়া যাইতে বহু বিলম্ব ঘটে।......

এটা বোধ হয় সাধারণ। কিন্তু সীতাপতির অকস্মাৎ মৃত্যুর পর পুত্রবধূ লক্ষ্মীর প্রাণে যে-আতঙ্কের সঞ্চার হইল তাহা যেমন দুঃসহ প্রবল তেমনি নিরেট, অব্যক্ত; তাহা মুখ ফুটিয়া পরের কাছে বলিবার নয়, নিজেরই মনের সঙ্গে সে-কথা লইয়া বুঝি তর্ক করাও চলে না।

প্রথম রাত্রি তার নির্ব্বিঘ্নেই কাটিল।

দ্বিতীয় দিন স্বামী মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া মৃৎপাত্রে বায়সভোজ্য ক্ষীরোদক দিতেছেন,—তিন মাসের শিশুপুত্রটিকে কোলে করিয়া অদূরে বসিয়া উদক্‌দান দেখিতে দেখিতে লক্ষ্মীর সহসা আশ্চর্য্য দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়া গেল—সে দেখিল, উদকাধারের ঊর্দ্ধস্থিত বায়ু যেন জৈবিক একটা আকার ধারণ করিতে-করিতে একখানা স্বচ্ছ অথচ সুস্পষ্ট মুখাবয়বে রূপান্তরিত হইয়া শূন্যে ভাসিতে লাগিল ; আর সে মুখখানা –

লক্ষ্মী সভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ফেলিল ; ক্রোড়স্থ শিশু কাঁদিয়া উঠিল ; পরক্ষণেই চোখ মেলিয়া লক্ষ্মী দেখিল মুখ অন্তর্হিত হইয়াছে।

ইহার পর দিনমান নিরুপদ্রবেই কাটিয়া গেল। কিন্তু লক্ষ্মীর প্রাণের উপর যে-ছায়াপাত হইয়াছিল সেটা মুছিল না।……

সন্ধ্যা অজ্ঞাতলোকের সমস্ত প্রচ্ছন্নতার কুহকপীড়ন লইয়া ঘনাইয়া আসিল ; আবছায়া অন্ধকারের দিকে ভাল করিয়া চোখ মেলিয়া চাহিতেও ভয়ে লক্ষ্মীর গা ভারি হইয়া উঠিতে লাগিল।—পল্লী-আবাসের চতুর্দ্দিকের অনিবিড় বিস্তৃত জঙ্গল অন্ধকারের বাঁধনে একাকার হইয়া ক্রমে জমাট কঠিন হইয়া উঠিল ; তার ঊর্দ্ধেই আকাশের খানিকটা নক্ষত্রের দুর্ব্বল আলোকে আর বাষ্পের আবরণে রহস্যগভীর ; দীর্ঘদেহ নারিকেল, সুপারি প্রভৃতি গাছের শ্রেণীবদ্ধ মাথাগুলি দুলিয়া-দুলিয়া পাতায় পাতায় একটা সির্ সির্ শব্দ উঠিতেছে—যেন কাদের কানে কানে ফিস্ ফিস্ কথা। বাড়ীর উত্তরকোণে ঘনপত্র বৃহদাকার একটি গাবগাছ—তাহার সর্ব্বাঙ্গে জোনাকি হাজারে হাজারে অদৃশ্য জীবের অসংখ্য চক্ষুর মত টিপ্ টিপ্ করিয়া নিবিয়া-নিবিয়া জ্বলিতেছে ; আলোকের ঐটুকু স্পর্শে সেই স্থানের অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া আছে ; সে যেন কি বলিতে চায় —কিন্তু না বলিতে পারিয়া প্রাণপণ ব্যাকুলতায় হাঁপাইতেছে।

লক্ষ্মীর স্নায়ুকেন্দ্র নিরতিশয় তীক্ষ্ণ হইয়া এই নিঃশব্দ অন্ধকারের ভিতর হইতে গুপ্ত অথচ অবিশ্রান্ত একটি চঞ্চলতার আঘাত গ্রহণ করিতে লাগিল।—প্রত্যেক অলক্ষিত স্থানেই যেন একটা অতীন্দ্রিয় গতিবিধি চলিতেছে ; কি একটা যেন গা ঢাকা দিয়া লুকাইয়া আছে—সে ছায়া নয়, বস্তু নয়, অথচ যেন তা' ছায়া বস্তু দুই-ই ; ঐ সে সরিয়া গেল, ঐ সে অগ্রসর হইতেছে, ঐ দেখা যায়, ঐ মিলাইয়া গেল—এম্‌নি একটা লুকোচুরি লক্ষ্মীর চোখের সাম্‌নে অবিরাম চলিতে লাগিল।

লক্ষ্মী ধীরে ধীরে যাইয়া শ্বশ্রূর গা ঘেঁসিয়া বসিল। কিন্তু সেস্থান হইতেও ওদিক্‌কার শুইবার ঘরখানার ভিতর পর্য্যন্ত তাহার চোখে পড়িতেছিল। লক্ষ্মীর মনে হইল, সেখানেও একটা নড়াচড়া, চলাফেরা, উঁকিঝুঁকি চলিতেছে—ঘরের বদ্ধবাতাসে যেন কার মর্ম্মান্তিক দীর্ঘ-নিঃশ্বাসের তরঙ্গ বহিয়া চলিয়াছে।……আর কোনো দিকে না চাহিয়া সুমুখের প্রজ্জ্বলিত বাতিটার দিকে লক্ষ্মী অপলকনেত্রে চাহিয়া রহিল।

রাত্রে খুব সতর্ক হইয়া সকলে শয়ন করিলেন।

মানুষ মনে করে, পরলোকের যে-স্তর পর্য্যন্ত সংসারিক বন্ধন-মায়ার আকর্ষণলীলা চলিতে থাকে তাহার গণ্ডী অতিক্রম করিতে মৃতাত্মা সহজে পারে না; সুতরাং আসক্তির দুর্ণিবার টানে তাহার পক্ষে নিকটতম প্রিয়তম জনের একান্ত সমীপবর্ত্তী হওয়া কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু অনেকগুলি তুক্ আছে—তাহারা নাকি মৃতাত্মাকে দূরে দূরে রাখে।

সে-রাত্রি ও পরের দিবাভাগটি অম্‌নিই কাটিল। কিন্তু চতুর্থ দিন সন্ধ্যার সময় লক্ষ্মীর মনে হইল, বায়ুমণ্ডল যেন সেই অমানুষিক চঞ্চলতার তাড়সে চিড়্ খাইয়া কাঁপিয়া-কাঁপিয়া উঠিতেছে। বাড়ীর অন্ধকার যেন ঠিক অন্ধকার নয়—যেন বিশালপক্ষ একটা পক্ষী বাড়ীর এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ডানায় ঢাকিয়া গোপন ও অগণ্য আনাগোনার একটা ষড়যন্ত্রের উপর হুম্‌ড়ি খাইয়া পড়িয়া আছে—সে যেন উঠি-উঠি করিতেছে; সে উঠিয়া গেলেই ষড়যন্ত্রকারীরা ভগ্নস্তূপ ক্রিমির মত পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িবে।......

এম্‌নি ধারা ভয়ঙ্করের দুশ্চ্ছেদ্য একটা মোহ আছে; সে যেন মনটাকে ফাঁদে জড়াইয়া ফেলে। আবিষ্ট বন্দী মনের প্রাণান্তকর ছট্‌ফটানির শেষ হয় কেবল তখন, যখন এই দুঃসহ শীতল আব্‌হাওয়ার মধ্যে সে মূর্চ্ছিতের মত এলায়িত শ্লথ অসাড় হইয়া আসে।...লক্ষ্মীর মনও এম্‌নি বাঁধা পড়িয়াছিল—হঠাৎ স্বামীর খক্ খক্ কাশীর প্রচণ্ড শব্দে তাহার মন একটানে বন্ধনজাল ছিঁড়িয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া ধক্ ধক্ শব্দে দুলিতে লাগিল। সে জোর করিয়া নিজেকে সবেগে টানিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে ছেলের কাছে যাইয়া শুইয়া পড়িল।

নিকটেই আড়ালে স্বামী ও শ্বশ্রূ বসিয়া শ্রাদ্ধ-সম্পর্কীয় কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, কিন্তু তবু লক্ষ্মী ঘরের মধ্যে তিষ্ঠিতে পারিল না। অত্যল্পকাল পরেই সে ছেলেটিকে লইয়া তাড়াতাড়ি বারান্দায় আসিয়া শাশুড়ীর পাশে ঝুপ করিয়া বসিয়া পড়িল।

কাশীশ্বরী জিজ্ঞাসা করিলেন—কি, বৌমা ?

লক্ষ্মী কথা কহিতে পারিল না।

কাশীশ্বরী বলিলেন—অমন ক'রে চ'লে এলে যে ?

লক্ষ্মী কষ্টের সহিত বলিল,—কিছু না, মা, অম্‌নি।

তাহার বুকের মধ্যে কি করিতেছিল তাহা সেই জানে—ঘোম্‌টার মধ্যেও তাহার চোখের দু'পাতা যেন এক হইতে চাহিল না।

লক্ষ্মীর এই সত্রাস পলায়ন অকারণ নহে।

ছেলের পাশে শুইয়াই তাহার মনে হইতে লাগিল—ওদিক্‌কার খোলা জানালাটির ঠিক্ ও-ধারে আসিয়া কে যেন নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে, সে কেবলি গলা বাড়াইয়া উঁকি মারিয়া-মারিয়া

ঘরের ভিতর তাহাদেরই উপর দৃষ্টি ফেলিতেছে।...লক্ষ্মী মুখ তুলিয়া চাহিলেই দেখিতে পাইত জানালায় কেহই নাই;—কিন্তু এই নিদারুণ অনিশ্চিতকে ভালমন্দ যে-কোনো প্রকার সুনিশ্চিতে পরিণত দেখিবার মত দৃঢ়তা তার অবশ মনের ছিল না। আতঙ্কটা উত্তরোত্তর উৎকট হইয়া লক্ষ্মীর শ্বাসপ্রশ্বাসের রন্ধ্রপথটি চাপিয়া-চাপিয়া তাহাকে যেন অজ্ঞান করিয়া ঠেলিয়া লইয়া বাহিরে ফেলিল।

কাশীশ্বরী মনে মনে বুঝিলেন, বধূ ভয় পাইয়াছে। তিনি লক্ষ্মীর পিঠের উপর সস্নেহে হাত রাখিয়া বলিলেন,—শ্রাদ্ধটা না শেষ হওয়া পর্য্যন্ত সন্ধ্যার পর এক্‌লা কোথাও থেক না, মা।

সীতাপতি শিশুর নাম রাখিয়াছিলেন, আলো। সেই রাত্রে সীতাপতিরই কণ্ঠের শব্দে লক্ষ্মীর ঘুম ছ্যাঁৎ করিয়া ভাঙিয়া গেল। লক্ষ্মী যেন শুনিল, সীতাপতি বাহির হইতে গভীর-স্বরে ডাকিতেছেন, আলো?—ঐ একটিবার মাত্র,—লক্ষ্মী ধড়্‌ফড়্‌ করিয়া উঠিয়া বসিয়া আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিল,—মা?

শাশুড়ী জবাব দিলেন,—কি, বৌমা?

—কে যেন খোকাকে ডাক্‌লে, শোননি?

—না, আমি ত শুনিনি, জেগেই ত' আছি।

লক্ষ্মী বলিল,—আলো ব'লে ডাক্‌ল।

বাড়ীর অপরাপর সবাই শিশুকে খোকা বলিয়া ডাকে; কেবল সীতাপতি ডাকিতেন আলো বলিয়া। লক্ষ্মীর কথা শুনিয়া এবং তাহার কণ্ঠস্বরে অপরিচিত একটি উদ্বেলতা লক্ষ্য করিয়া কাশীশ্বরী উঠিয়া তেলের প্রদীপটি জ্বালিলেন; এবং দীপহস্তে লক্ষ্মীর শয্যাপ্রান্তে যাইয়া শিশুর মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন, শিশুরা যেমন ঘুমায় সেও তেমনি নিশ্চিন্ত আরামে সুস্থ নিদ্রায় অভিভূত।

কাশীশ্বরী খোকার ও লক্ষ্মীর শিয়রে বসিয়া রহিলেন; সে-রাত্রি তাঁহাদের জাগিয়া কাটিল।

পরদিন মধ্যাহ্নে হঠাৎ একবার শিশুর মুখের দিকে চাহিয়া কাশীশ্বরী চম্‌কিয়া উঠিলেন; শিশুর চোখে জ্ঞানের ও ধারণাশক্তির অভাবের যে সহজ স্বচ্ছ সরল নিস্তেজ দৃষ্টি থাকে খোকার চোখে তাহা যেন নাই।—জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি তার সম্যক্ বিকাশপ্রাপ্ত জাগ্রত কর্ম্মক্ষম হইয়া পৃথিবীর সঙ্গে শিশু আত্মাটির পরিচয় সম্পূর্ণ হইয়া গেছে, এমনি তার সজ্ঞান দৃষ্টি। দেখিয়া কাশীশ্বরী যেমন বিস্মিত হইলেন তেমনি ভীতও হইলেন; কিন্তু মুখে তিনি মনের ভয়

ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করিলেন না। সেইদিনই তিনি গোপনে একটি মাদুলি সংগ্রহ করিয়া শিশুর গলায় পরাইয়া দিলেন।

লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল,—মাদুলী কিসের, মা ?

কাশীশ্বরী নিঃস্পৃহস্বরে বলিলেন,—তুমি যে কাল ভয় পেয়েছিলে, বৌমা, তাই।

কথাটি ঠিক পরিষ্কার হইল না, কিন্তু লক্ষ্মী মনে মনে বুঝিল, অকল্যাণকর একটি ভয়ের ছায়াপাত শাশুড়ীর প্রাণেও হইয়াছে। বুকটা তার হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল।

রাত্রের প্রথমভাগে লক্ষ্মীর চোখে ঘুম আসিল না। প্রবলবেগে বাতাস বহিতেছিল। রাত্রির অন্ধকার যেন এই দুর্দ্দিনে তার অন্তরস্থ শূন্য ক্ষুধিত মহাগহ্বরটির মুখের আবরণ তুলিয়া ধরিয়াছে, আর পৃথিবীর কঠিন অকঠিন সমুদয় বস্তু বায়ুবেগে ক্ষয় হইয়া তাহারই মধ্যে হুহু শব্দে ঢালিয়া পড়িতেছে।...দূরে কোথায় একটি কুকুর তারস্বরে চীৎকার করিয়া থামিয়া-থামিয়া কাঁদিতেছিল—সে-শব্দটা যেন আসন্ন অনিবার্য্য বিনাশের শঙ্কায় আতুরা ধরণীরই সবিরাম আর্ত্ত হা হা রব।

ঘরে দীপশিখাটি নাচিতেছিল : সে-দিকে চাহিয়া লক্ষ্মীর সহসা মনে হইল, যেন কাহার রক্তাক্ত লেলিহান্ জিহ্বা লক্ লক্ করিয়া বায়ুর স্তরপ্রান্ত লেহন করিতেছে।......লক্ষ্মী পাশ ফিরিয়া শুইল।...শাশুড়ীর সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে লক্ষ্মীর কখন ঈষৎ একটু তন্দ্রার ঘোর আসিয়াছিল—ঘোর ভাঙ্গিয়া হঠাৎ সে জাগিয়া দেখিল, ঘরের প্রদীপ নিবিয়া গেছে, এবং ঘোর অন্ধকারেও সে স্পস্ট দেখিতে পাইল, কে যেন দ্বারের বাহির হইতে চৌকাঠের ফাঁক দিয়া হাত বাড়াইয়া ঘরের ভিতরকার মাটি হাত্ড়াইতেছে।......

—মা, মাগো !

বধূর ভীত চীৎকারে কাশীশ্বরী, 'কি হ'ল কি হ'ল' বলিতে বলিতে শশব্যস্তে উঠিয়া বসিয়া প্রদীপ জ্বালিলেন; দেখিলেন, বধূ উঠিয়া দাঁড়াইয়া পাতাটির মত হি হি করিয়া কাঁপিতেছে; তার চক্ষু মুদ্রিত, মুখ বিবর্ণ, দাঁতে দাঁতে ঠক্ ঠক্ করিয়া বাজিতেছে। শিশু নিদ্রামগ্ন।

কাশীশ্বরীর অধীর জিজ্ঞাসার উত্তরে লক্ষ্মী বলিল,—ঐ ফাঁক দিয়ে কে হাত বাড়িয়ে মাটি হাত্ড়াচ্ছিল।—বলিয়া সে কম্পিতহস্তে চৌকাঠ দেখাইয়া দিয়া 'মাগো' বলিয়া বসিয়া পড়িল।

কাশীশ্বরী জানিতেন, ভয় তাড়াইবার উপায় তর্ক নয়। কাজেই বধূকে কিছু না বলিয়া তিনি ছেলেদের এই ঘরে ডাকিয়া আনিলেন। তাঁহারা দু'ভাই আদি-অন্ত অবগত হইয়া একেবারেই হাসিয়া উঠিলেন। তাঁহারা যাহা বলিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত সার এই—স্ত্রীলোকের দুর্ব্বল মস্তিষ্কে সবই সম্ভব, বিভীষিকা দেখাও আশ্চর্য্য নয়। বাড়ীতে মৃত্যু ঘটিলে মানুষে ভয় পাইয়াছে এ কথা ইতিপূর্ব্বেও শোনা গেছে। তারপর তাঁহারা উপসংহারে বলিলেন—ও সেরে যাবে।

সারিল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যভাবে। কাশীশ্বরী বা তাঁর ছেলেরা বুঝিতেই পারেন নাই যে, আতঙ্কটা লক্ষ্মীর প্রাণে সময় সময় দমকা হাওয়ার মত ছুটিয়া আসিয়া বহিয়া যাইত না – সেটা তার মস্তিষ্কের চারিপ্রান্ত জুড়িয়া অহরহ ঘূর্ণীর সৃষ্টি করিতেছিল।......লক্ষ্মী দিবারাত্র বিভীষিকা দেখিতেই লাগিল—শেষে অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে, চোখ বুজিলেই তাহার মনে হয়, কে যেন ঘরের সহস্র ছিদ্রপথে অসংখ্য অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া কি যেন টানিয়া টানিয়া লইতেছে।

ষষ্ঠদিনে সকলেই লক্ষ্য করিল যে, শিশুর দেহ এক রাত্রেই যেন কাঠির মত শুষ্ক হইয়া গেছে। প্রাণপণে চুষিয়া অভ্যন্তরের সমস্ত রস বাহির করিয়া লইলে রসাল ফলটির যেমন আকৃতি হয় শিশুর সর্ব্বাবয়বের আকৃতি ঠিক্ সেইরূপ বিকৃত—মাথাটি ছাড়া সর্ব্বাঙ্গ যেন নীরস হইয়া চুপ্‌সিয়া আয়তনে একেবারে অর্দ্ধেক হইয়া গেছে। কাশীশ্বরীও দেখিলেন; দেখিয়া তিনি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন; শিশুর অস্বাভাবিক উজ্জ্বল বিশাল চক্ষুদুটির দিকে চাহিয়া কাশীশ্বরী ও লক্ষ্মীর বুকের ভিতর আগুন জ্বলিয়া উঠিল।—এত বড় মর্ম্মান্তিক দুর্ঘটনা মানুষের জীবনে বুঝি দুটি ঘটিতে পারে না: চোখের উপর শিশুহনন চলিতেছে—অথচ ত্রিভুবনের কুত্রাপি তার প্রতিকারের কোনো উপায়ই মানুষের জানা নাই, বাধা দিবার সাধ্য নাই; সান্ত্বনা নাই! হেতু যতই অনির্দ্দেশ্য হোক্ ফল সম্বন্ধে কাহারও মনে তিলমাত্র সংশয় রহিল না। নিরুপায়ের অসহ্য যন্ত্রণায় কাশীশ্বরীর বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল; তিনি অবিরাম কাঁদিতে লাগিলেন। পুত্রটিকে বুকে করিয়া লক্ষ্মী নির্ব্বাক্ স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

সে রাত্রিতে কেহ কাহারও কাছছাড়া হইল না।......স্তিমিত প্রদীপটিকে ঘিরিয়া বসিয়া একটা অজ্ঞাত ত্রাসে সবাই নিঃশব্দ—রাত্রি নীরব, মানুষের কণ্ঠ নীরব।

লক্ষ্মীর আর্ত্তনাদে সহসা সেই কঠিন নীরবতা বিদীর্ণ হইয়া মায়াজগৎ ধূলিসাৎ হইয়া গেল ; কাশীশ্বরী কাঁপিয়া উঠিয়া শিশুর বুকের উপর হাত রাখিলেন ; দেখিলেন, নিঃশেষিত-তৈল শিশু-দীপটী কখন যেন নিবিয়া গেছে।- -

লক্ষ্মী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।—

যখন তাহার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল, তখন প্রকৃতির অপ্রাকৃতিক সমস্ত সংক্ষোভ শান্ত হইয়া গেছে।
